অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩

আনন্দমেলা

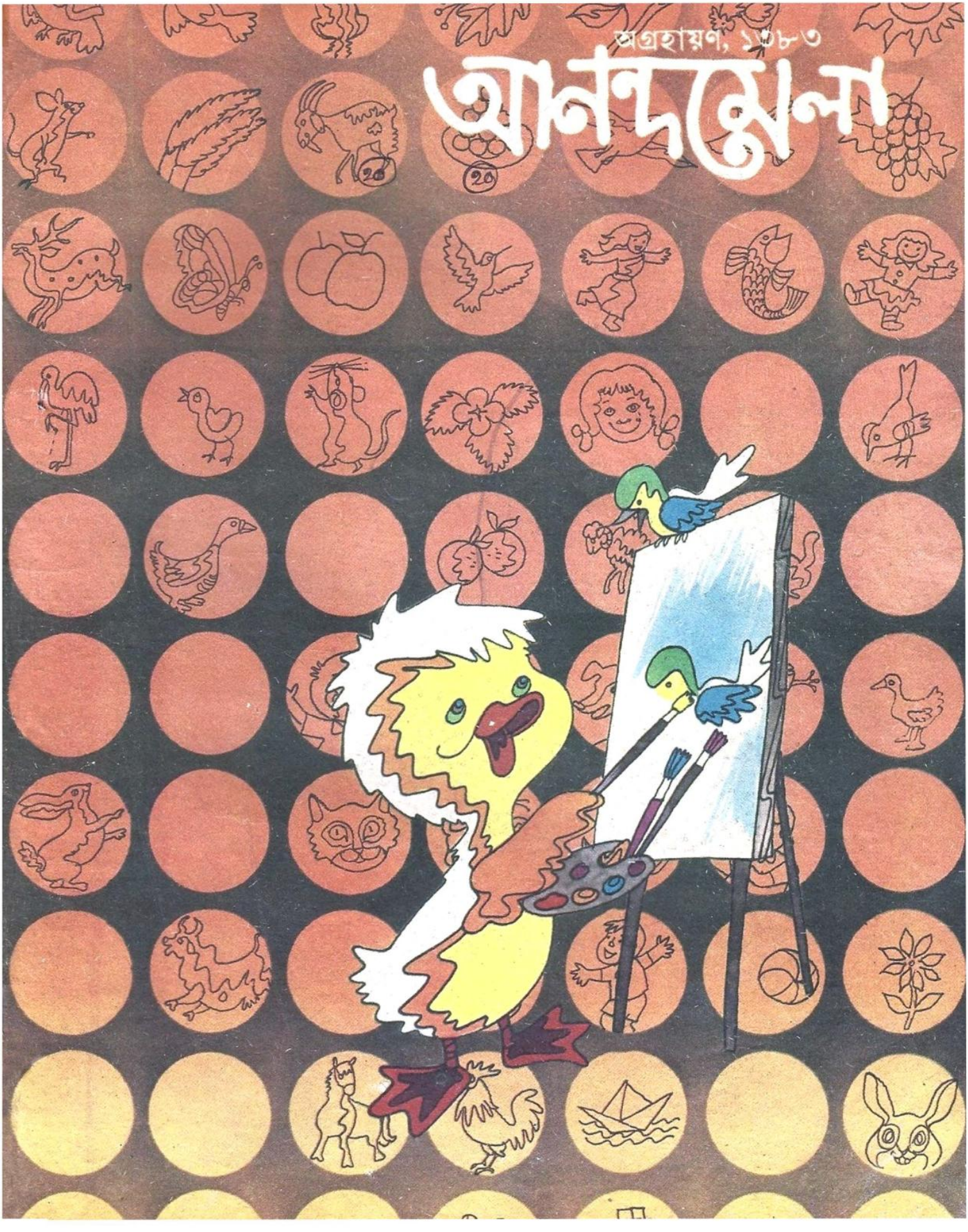

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime
Special thanks to Samudra Basu for two missing pages

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

এ কি শুধু কাপড়ের স্মৃতি ?
না, মনে রাখার মত কাপড় !
মনে রাখুন। একমাত্র বিনীর সুতী
কাপড় এত মজবুত ও টেকসই
যে বহুদিন ধকল সইতে পারে।
বিনী—যেমন সৌখীন তেমন টেকসই সুতী কাপড়

আনন্দমেলা

গল্প
পিলখানা । লীলা মজুমদার ৬
চোর ধরা । প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ১২
সেই বইটা । অজেয় রায় ২৪

ছড়া
ভূত-পেত্নী । রঞ্জন ভাদুড়ী ৮
বিল্লী । বিমল ঘোষ (মৌমাছি) ৯
রাজা রে রাজা । পবিত্র সরকার ২৭
হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টি । জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ৩৪

বিশেষ রচনা
বাড়ির মধ্যে চিড়িয়াখানা । তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫
ছোট্ট দুটি হরিণছানা ১০

উপন্যাস
সবুজ দ্বীপের রাজা । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২০
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩২

কমিক্‌স
টারজান ১৪, ১৫, ১৮, ১৯
টিনটিন/বোম্বেটে জাহাজ ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩
ডাইনোসর চুরি ২৮, গাবলু ৪৭

খেলাধুলো
বিজয়ের কী হল । সুব্রত সরকার ৪৮
সারা মাঠে হাসি । পুষ্পেন সরকার ৪৯
ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের বোঝাপড়া । বজ্রসেন ৫১

লেখাপড়া
বাগবাজার মালটিপারপাসের প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন ৩০
কীভাবে তৈরী হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল ৩১

অন্যান্য লেখা
ছোটদের ছবি, শব্দ-সন্ধান ১৩
মাসটা অগ্রহায়ণ, বিজ্ঞান-বিচিত্রা ১৬
বানাও । পূর্ণেন্দু পত্রী ১৭
কলামন্দিরে তাসের দেশ ২৭
বড়দের কথা । ইন্দ্রমিত্র ২৭
মজার পড়া । কুন্তক ৩৭
আমাদের কলকাতা । রত্নাকর ৪০
মণিমেলার খবর, ভাবতে পারো ৪১
শেখো, আঁকো ৪৪
ম্যাজিক ৪৫
ডোডো-তাতাই । তারাপদ রায় ৪৫
ধাঁধা, আচ্ছা বলো তো ৪৬
তোমাদের পাতা ৫৪

অলংকরণ
এ-মাসের প্রচ্ছদ-শিল্পী
অলোক ধর।
ারের পাতায় ম্যাকাওয়ের ছবি
ারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা।

'পিলখানা'র
ছবি এঁকেছেন সমীর সরকার;
ূতপেত্নী', 'রাজা রে রাজা' ও
'হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টি'র ছবি
এঁকেছেন অসিত পাল;
'বিল্লী'র ছবি এঁকেছেন
বতীভূষণ ঘোষ; 'চোর ধরা' ও
'সবুজ দ্বীপের রাজা'র ছবি
এঁকেছেন মদন সরকার;
'সেই বইটা'র ছবি এঁকেছেন
বাল ঘোষ; 'মনোজদের অদ্ভুত
বাড়ি'র ছবি এঁকেছেন
সুধীর মৈত্র।

দ্বিতীয় বর্ষ
অষ্টম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৩৮৩
নভেম্বর ১৯৭৬
দেড় টাকা

সম্পাদক
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডএর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল :
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সূচীপত্র

বাড়ির মধ্যে চিড়িয়াখানা

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোর পাঁচটা নাগাদ ট্রেনটা এসে দাঁড়াল যশিডি স্টেশনে। যশিডির ঘুম তখনো ভাঙেনি, কিন্তু স্টেশনের বাইরে টাঙ্গা-ওয়ালারা দেখলাম খুবই সজাগ এবং তৎপর। সামনে-পেছনে প্রচণ্ড ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির মধ্যে একটি টাঙ্গা বেছে নিয়ে তাকে গন্তব্যস্থান বলতেই টাঙ্গাওয়ালার ভ্রূ কুঁচকে গেল। বললে, "ইতনা সুবে সুবে আপলোগ উঁহা যাকে ক্যা করেঙ্গে। উও চিড়িয়াখানা সামকো চার সে ছে তক্ খুলা রহতা।"

এবারে তো আমার ভ্রূ কুঁচকে যাবার পালা বিস্ময়ের ধাক্কায়। যেতে চাইলাম আমার গন্তব্যস্থানে, আর টাঙ্গাওয়ালা কিনা আমাকে ভেবে নিল চিড়িয়াখানার যাত্রী!

যাই হোক, আপাতত তো গন্তব্যস্থলে যাওয়া যাক। পথে যেতে যেতে টাঙ্গাওয়ালাকে জিগ্যেস করলাম, "যশিডি তো এই এতটুকু জায়গা, এখানে আবার চিড়িয়াখানা এল কোত্থেকে?"

টাঙ্গাওয়ালা জবাব দিলে, "আপলোক যিস বাংলোমে যাতেহেঁ, ওহি বাংলোকা বাবু নে এক চিড়িয়াখানা বনায়া—" বলতে বলতে চাবুকসমেত হাতটা তুলে দেখিয়ে দিলে, "উধার দেখিয়ে, ওহি হ্যায় চিড়িয়াখানা।"

দেখলাম, ওদিকে গাছের মাথায় ঝোলানো ছোট্ট একটি বোর্ডে লেখা আছে, চিড়িয়াখানা।

বিকেল চারটে নাগাদ ওই সাইনবোর্ডের নীচে দিয়ে ঢুকলাম চিড়িয়াখানায়। বেশ ছোটখাট একটা ভিড় জমেছে চিড়িয়াখানা দেখতে। ওই চিড়িয়াখানার জন্মবৃত্তান্ত শুনলাম। এটা এক বাঙালী ভদ্রলোকের শখের ব্যাপার। নাম দ্বারিক মিত্র। মিত্তিরমশাই অনেক টাকা পয়সা ব্যয় করে, অনেক মেহনত করে নানা অঞ্চল থেকে পশুপাখি সংগ্রহ করে তাঁর এই শখের চিড়িয়াখানাটি বানিয়েছেন। উনি এক পয়সাও দর্শনী নেন না দর্শনার্থীদের কাছ থেকে।

দর্শনার্থীর ভিড়ে আমিও নিজেকে মিশিয়ে দিলাম। প্রথমেই নজরে পড়ল খাঁচার মধ্যে ভারী সুন্দর দেখতে কয়েকটা টিয়া। নাম ঃ ডেরবিয়ান প্যারাকেট।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। একটা বাচ্চা ছেলে যেন কোথা থেকে চেঁচিয়ে উঠল ঃ কে গো—কে গো?

ওই আওয়াজের উত্তরে আমাদের সামনের খাঁচার মধ্যে থেকে একটা সাদা কাকাতুয়া কী যেন বিড়বিড় করে বকে গেল। ওর বিড়বিড়ানি থামতে না থামতেই আবার সেই কচিকণ্ঠ ঃ কে গো—কে গো?

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোধগম্য হল। বাচ্চা ছেলের আওয়াজ আসছে টিয়াপাখির কণ্ঠ থেকে। ওই টিয়া ও কাকাতুয়ার মধ্যে কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ চলল।

একটু এগোতেই দেখতে পেলাম নানা রঙের একঝাঁক সেনিগাল প্যারট। হলদে, সবুজ, লাল-সবুজে মাখামাখি। তাদের পাশাপাশি সাত-আট রকমের ম্যাকাও পাখি। তাদের মধ্যে কোন-কোনটার মুখ বাঘের মত। শুনলাম একটি ম্যাকাও নাকি একবার ডিমও পেড়েছিল, কিন্তু বাচ্চা ফোটেনি। এছাড়া আছে নানা রকমের কাকাতুয়া। কোনটা সাদা, কোনটা গোলাপী।

পূর্ব এশিয়ায় যাদের জন্ম সেই গোল্ডেন ফ্যাজেন্টার দেখা পেলাম এই চিড়িয়াখানায়। তার প্রতিবেশী হিসেবে রয়েছে হিমালয়ান কাঠবেড়ালি, শিম্পাঞ্জী আর একপাল খরগোশ। এই খরগোশগুলি মিত্তির মশাইয়ের খুব প্রিয়। উনি যখন এখানে থাকেন তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাজি ধরেন খরগোশ ধরার ব্যাপারে। আজ পর্যন্ত কেউ একটাও খরগোশ ধরতে পারেনি। ভারি চালাক ওরা। ধরতে গেলেই টুপটাপ লুকিয়ে পড়ে গর্তের মধ্যে।

একজোড়া ডোরাকাটা কচ্ছপও দেখলাম এখানে। আর আছে মিত্তিরমশাইয়ের খুব প্রিয় একটি বাঁদর। নাম ঃ সাহেব। দর্শনার্থীদের হাত ধরে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায় সাহেব। মেজাজ ভাল থাকলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গালে টুক করে একটি চুমু খেয়ে আদরও করে।

দুধসাদা ময়ূর আছে এখানে। রঙীন ময়ূরও আছে। পেখম তুলে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর দেখাদেখি পালক ফুলিয়ে পাখনা মেলে ঠিক যেন পেখম তোলার অনুকরণ করছে একটি টারকি কক। তার ধারণা সেও ময়ূরের মত পেখম তুলতে পেরেছে। মুখের ভাবটা খুব গম্ভীর-গম্ভীর।

না, এই চিড়িয়াখানায় বাঘ সিংহ নেই। বাঘের বাচ্চা একটা আনা হয়েছিল একবার, কিন্তু টেঁকেনি, মারা গেছে।

তবে হরিণ আছে বেশ কয়েকটা। দুই ধরনের। স্পটেড ডিয়ার আর বার্কিং ডিয়ার। খোলা জায়গায় নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। চিড়িয়াখানা দেখা শেষ করে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ একটা বাচ্চা হরিণ পিছন থেকে এসে ঢুসো মেরে পালাল। বুঝতে পারলাম না ওর উদ্দেশ্যটা কী! ও কি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গেল, নাকি রাগ দেখিয়ে বলল, যাও এবার!

পিলখানা

লীলা মজুমদার

মনটন খুব খারাপ। তা আর হবে না? পুজোর সময়ে হাওড়ার এই গলিতে আটকা আছি। আটকা কেন, একরকম বলতে গেলে কয়েদী আসামী হয়েই আছি। জেলখানার বন্দীরাও এর চেয়ে খারাপভাবে থাকে না। বেরুতে দেয় না, কথা বলবার লোক নেই, দেয়ালের ঐ ছোট চারকোনা জানলাটা খুলে দিনে তিনবার আমার খাবার ঢুকিয়েই, আবার দড়াম করে বন্ধ করে দেয়, পাছে আমার গায়ের জল-বসন্তের বীজ ওদের গায়ে লেগে যায়। বাড়িতে তো দেখে এলাম, মা রোজ রাতে বুল্টির সঙ্গে এক খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

নাকি আমার পড়ার ব্যাঘাত হতে পারে। গায়ে গুটি গুটি মতো বেরুলে পড়ার কী করে ব্যাঘাত হয় বুঝলাম না। আর পুজোর ছুটিতে কেউ পড়ে নাকি? তা কে শোনে! অমনি বলা নেই, কওয়া নেই, আমাকে বগল-দাবাই করে এনে খুড়ো-দাদু এইখানে পুরেছে। কী খারাপ খেতে দেয় কী বলব। সবটাতে তেঁতুল-গোলা। তাহলে নাকি জল-বসন্ত হয় না। যত সব বাজে কথা।

এখন সন্ধে হয়ে গেছে, আজ ষষ্ঠী, দূরে কাদের বাড়িতে পুজো হচ্ছে, কাছেও পুজো হচ্ছে, সব জায়গায় হচ্ছে, বাজনা বাজছে। কিচ্ছু দেখতেও পাচ্ছি না। আমার জানলার নীচের গলিটা আসলে এই বাড়ির নিজস্ব গলি। বেশ চওড়া। ও দিকের বাড়ির সব জানলা ইঁট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করা। নাকি একশো বছর আগে দুই শরিকে হাতি ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। সায়েব হাকিম এসে এই ব্যবস্থা করেছিল। তাই ওদের নাকি এখনো রাগ আছে, বলে সায়েব ঘুষ খেয়েছিল। এদের সঙ্গে কথা বন্ধ।

এই বাড়িটা নাকি দুশো বছরের পুরনো। এই পাড়াটাই দুশো বছরের হবে, খোলা খোলা নর্দমা, রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢুকতে সিঁড়ি দিয়ে না-উঠে, এক ধাপ করে নামতে হয়। সেদিন খুব বৃষ্টি হল আর রাস্তার সব জল সক্কলের বাড়ির একতলায় গিয়ে জমা হল। জিনিসপত্র সব উঁচু-উঁচু তক্তাপোষে তোলা, পা উঠিয়ে বসে যে যার কাজ করে যেতে লাগল, কারো কোনো অসুবিধা হল না। দুশো বছরের অভ্যেস। বাড়িতে এই সময়ে আমরা খাই। গরম গরম হাতরুটি করে দেয় পিসিমা, আমরা ছক্কা দিয়ে, আলুর দম দিয়ে খাই। তারপর একটা বড় কলা, কিম্বা আম, কিম্বা আতা খাই। এই গলিটার ভিতর দিকে একটা আতাগাছ দেখতে পাই, তাতে বড়-বড় আতা পেকেছে। মা থাকলে...যাকগে, আমার এগারো বছর বয়স হয়ে গেছে, আজকাল আমি আর কাঁদিটাদি না। কিন্তু এরা রাতে আমাকে চিনি না-দিয়ে দুধ-সাবু দেয়, তা নইলে নাকি আমার জল-বসন্ত হবে। সে কখন খাওয়া হয়ে গেছে, আবার আমার খিদে পেয়েছে।

আমি আসবার আগে পিসিমা বলেছিল এটাই নাকি আমাদের পৈতৃক বাড়ি। দুশো বছর ধরে আমরা সবাই এখানেই জন্মেছি, এখানেই মরেছি। ভাব একবার! একতলার ছাদ বেজায় নিচু, কিন্তু দোতলা-তিনতলার ছাদগুলো এমনি উঁচু যে, রাতে ভালো করে দেখা যায় না। দেয়ালে লাগা আলো অতদূর পৌঁছয় না। যা-কিছু ওখানে আঁকড়ে-মাকড়ে ঝুলে থাকতে পারে, তারপর এক সময় সুবিধা বুঝে ঝুপ করে আমার ওপর পড়ে, আগে থাকতে আমি টেরও পাব না। এ ঘরের সঙ্গে লাগা স্নানের ঘর। ঘরের দরজা বাইরে থেকে ছিটকিনি দেওয়া থাকে। নইলে বাড়ির অন্য ছেলেদের মধ্যে যদি রোগ ছড়ায়। খুড়ো-দাদু একবার করে এসে আমাকে পড়ায়। রাতে ঘরটা অন্ধকার হয়ে যায়, গলিতে বাতি নেই। ছিল একসময় নিশ্চয়, দেয়ালে মস্ত একটা ব্র্যাকেট গাঁথা ছিল। রাতে আমার ভয় করে। ঘুম ভেঙে যায়। বলেছি না মনটন খুব খারাপ। বাবাকে একটা চিঠি লিখতে পারলে হত। এই আলোতেই লিখতে পারতাম, যদি একটা পোস্টকার্ড পেতাম।

আমার আবার কম মন খারাপ হলে ঘুম আসে না, বেশী মন খারাপ হলে বেজায় ঘুম পায়। ঘুমিয়েই পড়েছিলাম প্রায় কারিকুরি-করা উঁচু খাটটার ওপর, এমন সময় মনে হল কোথায় টুংটাং করে আস্তে আস্তে অনেকগুলো ঘণ্টা বাজছে আর নাকে

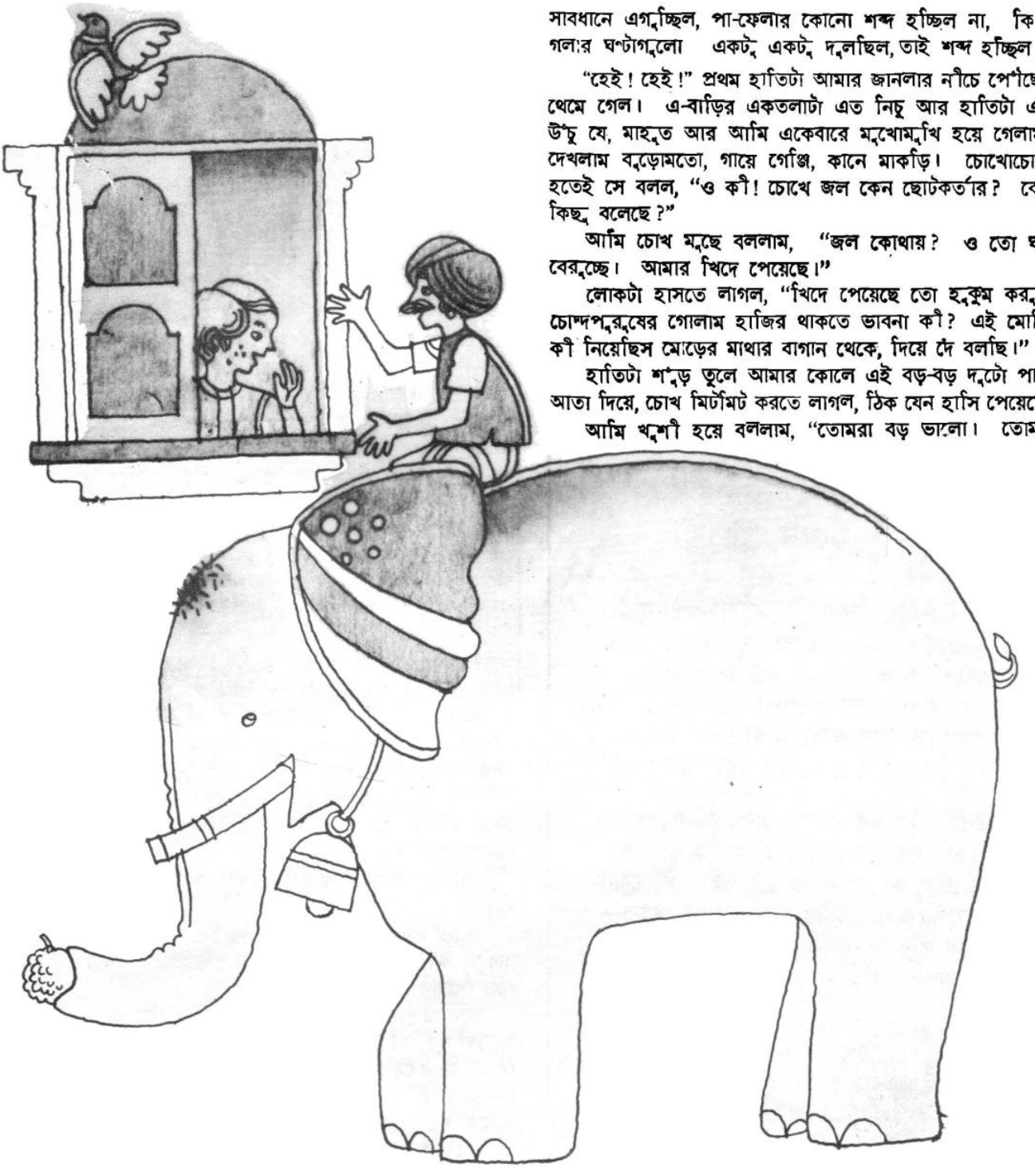

এল কেমন একটা অদ্ভুত জানোয়ার-পানা গন্ধ। নিশ্চয়ই বুড়ো চৌধুরী এ-বছর পুজোয় যাত্রার বদলে সারকাসের ব্যবস্থা করেছেন। আমাকে অবিশ্যি কোনোটাই দেখতে দেবে না। এক যদি বাবা কোনো-রকমে টের পেয়ে—নাঃ, শব্দটা বড্ড বেশী কাছে এসে পড়েছিল।

অমনি উঠে পড়ে ছুটে গেলাম জানলার কাছে। বাইরে তাকিয়ে আমার চক্ষুঃস্থির। একটা-দুটো নয়, গলি দিয়ে একটার পর একটা কুড়িটা হাতি আসছে, প্রত্যেকের ঘাড়ে মাথায় ফাল্টা-বাঁধা মাহুত আর গলায় ঘণ্টা। দেয়ালের পুরনো ব্র্যাকেটে কে একটা সেকেলে লণ্ঠন ঝুলিয়েছিল, তারই আলোতে হাতিগুলো সাবধানে এগুচ্ছিল, পা-ফেলার কোনো শব্দ হচ্ছিল না, কিন্তু গলার ঘণ্টাগুলো একটু একটু দুলছিল, তাই শব্দ হচ্ছিল।

"হেই! হেই!" প্রথম হাতিটা আমার জানলার নীচে পৌঁছেই থেমে গেল। এ-বাড়ির একতলাটা এত নিচু আর হাতিটা এত উঁচু যে, মাহুত আর আমি একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেলাম। দেখলাম বুড়োমতো, গায়ে গেঞ্জি, কানে মাকড়ি। চোখোচোখি হতেই সে বলল, "ও কী! চোখে জল কেন ছোটকর্তার? কেউ কিছু বলেছে?"

আমি চোখ মুছে বললাম, "জল কোথায়? ও তো ঘাম বেরুচ্ছে। আমার খিদে পেয়েছে।"

লোকটা হাসতে লাগল, "খিদে পেয়েছে তো হুকুম করুন। চোদ্দপুরুষের গোলাম হাজির থাকতে ভাবনা কী? এই মোতি, কী নিয়েছিস মোড়ের মাথার বাগান থেকে, দিয়ে দে বলছি।"

হাতিটা শুঁড় তুলে আমার কোলে এই বড়-বড় দুটো পাকা আতা দিয়ে, চোখ মিটমিট করতে লাগল, ঠিক যেন হাসি পেয়েছে।

আমি খুশী হয়ে বললাম, "তোমরা বড় ভালো। তোমার নাম কী? কোথা থেকে আসছ?"

সে বলল, "আমি হাইদার, ছোটকর্তা, ঐ যে গলির ও মাথাটা এখান থেকে দেখা যায় না, ঐখানে আমাদের পিলখানা। সেখানে কুড়িটা হাতি থাকে। রোজ এই সময় বড় পুকুরে জল খাওয়াতে নিয়ে যাই। এই সময় পথঘাট ফাঁকা থাকে। দুটো-একটা হাতি আছে, ভিড় দেখলে এখনো ঘাবড়ায়। এরা সব বর্মী হাতি কিনা, আগে কখনো শহর দেখেনি। এবার চলি, কেমন? আতা খুয়ে খেও, মোতি শুঁড়ে করে এনেছে তো।"

আমি বললাম, "কাল আবার আসবে তো?"

হাইদার বলল, "রোজ রোজ আসব, এই সময়। তুমি কিন্তু ৭

ভূত পেত্নী

রঞ্জন ভাদুড়ী

ভূতের নাকি সুরটা নাকী, চক্ষু নাকি ভাঁটা,
শনের দড়ির মতন দাড়ি, গোঁফ-জোড়াটি ঝাঁটা,
বেহ্মদত্যি কারো-বা নাম, কেউ-বা কন্দকাটা
লিকলিকে পা, কেউ-বা গোদা, উলটো কারো হাঁটা,
জালার মতো বিশাল কারো হাঁ-টা—
—বলিসনে আর, শিউরে ওঠে গা-টা!

পেতনী নাকি বড্ড গেছো, এবং বেজায় খোনা,
শ্যাওড়া গাছে আস্তানা তার, অনেক ছানাপোনা,
বাচ্চা ছেলে কাঁদলে নাকি দুই গালে দেয় ঠোনা,
রাত-দুপুরে শাঁকচুন্নীর বিলাপ যাবে শোনা—
কোঁথায় পাঁব. গ'য়না গ'ড়ার সোঁনা—
—ভয় পেয়েছি, আর-কিছু শুনবো না।

মন খারাপ করনি। পালঙ্কের তলায় ঐ কাঁঠাল-কাঠের তোরঙ্গটা খুলে দেখ না কেন, তোমাদের চোদ্দ পুরুষের জমিয়ে রাখা কত মজার-মজার জিনিস আছে ওতে।"

আমি বললাম, "তাই নাকি? কেউ কিছু বলবে না তো?"

হাইদার বলল, "তোমার জিনিস তুমি হাটকাবে, কে আবার কী বলবেটা শুনি? এই বাড়িতে একশোটা ঘর, একশ্যেটা শরিক। এ-ঘরটা তোমাদের, তা জানতে না?"

হাতির সারি চলতে শুরু করল, গুনে দেখলাম মাঝে-মাঝে একটা করে বাচ্চা হাতি, সব নিয়ে কুড়িটা। আতা দুটো ধুয়ে খেয়ে ফেললাম। কী ভালো যে কী বলব।

পরদিন সকালে উঠে গলি দেখে বুঝবার জো ছিল না যে, রাতে ওখান দিয়ে কুড়িটা হাতি গেছে। তারা কখন ফিরেছিল, কে জানে। লণ্ঠনটাকেও দেখলাম নামিয়ে রেখেছে। একবার ভাবলাম খুড়ো-দাদুকে হাতির কথা জিজ্ঞাসা করব। তার পরেই মনে পড়ল বুড়ো চৌধুরীর সঙ্গে খুড়োদের একশো বছর কথা বন্ধ। তাদের ভাড়া-করা হাতি রাতে খুড়োদের গলি দিয়ে খুড়োদের বড় পুকুরে জল খেতে যায় শুনলে খুড়ো তো রেগে চতুর্ভুজ হবেন, তার ওপর হয়তো এ পথটাও বন্ধ করে দেবেন। তাহলে হাইদারের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

ভারী খিটখিটে খুড়ো-দাদু, হাতির কথা তাঁকে কোনোমতেই বলা যায় না। তবু পড়তে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, "গলির ও-মাথায় কারা থাকে, খুড়ো-দাদু?"

বেজায় রেগে গেলেন, "তোর তাতে কী দরকারটা শুনি? পড়াশুনোয় মন নেই, কেবল চারদিকে চোখ!" বলে এমনি হাঁড়িমুখ করে বসে রইলেন যে, আমি তখন কিছু বলতে সাহস পেলাম না।

উনি চলে যাবার সময় শুধু বললাম, "একটা পোস্টকার্ড দেবেন খুড়োদাদু? বাবাকে একটা চিঠি লিখব।"

"ওঃ! আমার বাপের ঠাকুরদা এলেন। যা খবর নেবার আমিই নিয়ে থাকি। সবাই ভালো আছে। তাই নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।"

বললাম, "বাইরে থেকে ছিটকিনি দেবেন না। আমি বেরোব না।"

খুড়ো-দাদু বললেন, "তারপর নিখোঁজ হয়ে গেলে তোর বাবাকে কী বলব শুনি?" এই বলে বাইরে থেকে ছিটকিনি দিয়ে চলে গেলেন।

দুপুরে খাটের তলার তোরঙ্গটা টেনে বের করে খুললাম। আশ্চর্য সব জিনিসে ভরতি। পুরোনো বাঘ-বন্দী খেলার ছক-কাটা বোর্ড, রবার-ছেঁড়া গুলতি, হলদে হয়ে যাওয়া পড়ার বই, ছেঁড়া কাপড়-চোপড়। আমার একটা ফটো। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমার এত পুরনো ফটো কী করে হবে? পিছনে আমার মতো হাতে লেখা, মণি রায়'। বাবার নাম। তাহলে বাবার ফটো। এ-ঘরে বাবা কি ছোটবেলায় থাকতেন? সারা দিন বসে অনেক পড়াশুনো করে ফেললাম।

কী করে বাবাকে একটা চিঠি লেখা যায়?

সন্ধের আগেই আমার দুধসাবু পৌঁছে দিয়ে, খুড়ো-দাদুরা সপ্তমী পুজো দেখতে গেলেন। তখন আমি জানলার কাছে বসে খুব খানিকটা কেঁদে নিলাম।

"হেই ! হেই!—এই দেখ! এ কী কাণ্ড!!"

মুখ তুলে দেখি একেবারে নাকের সামনে হাইদারের মুখ। আজ মোতি হাতিকে কিছু বলতে হল না, শুঁড় বাড়িয়ে নিজের থেকেই আমার হাতে আতা গুঁজে দিল। ওর শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দেখলাম কী নরম, কী মোলায়েম। মোতি আমার

চোখের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগল। তার পিছনে হাতির সারি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল।

হাইদার বলল, "কী হয়েছে বলবেনি?"

অমনি তাকে সব কথা বলে ফেললাম। শুনে হাইদার একটু-ক্ষণ চুপ করে বলল, "পোস্টকাট আবার কী?"

মুখ্যু বেচারী, পোস্টকাট জানে না। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার বাড়িতে চিঠি লেখ না? তাকেই বলে পোস্টকাট।"

হাইদার বলল, "চিঠি? চিঠি-কে নিয়ে যাবে, কর্তা? বছরে একবার নিজেই চিঠি হয়ে চলে যাই। কিন্তু তোমার জন্য তো একটা কিছু করতে হয়। আচ্ছা, যদি ঘর থেকে ছেড়ে দিই, একা-একা বাড়ি যেতে পারবে?"

"খুব পারব, নিশ্চয় পারব। কিন্তু ওরা তো সদর দরজায় তালা দিয়ে গেছে, কী করে খুলবে?"

হাইদার হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "শুনলি তো মোতি? কই, লাগা দিকিনি! জানলা থেকে সর কর্তা।"

সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল মোতি হাতি হাঁটু দিয়ে একতলার দেয়ালটা একটু ঠেলে দিল, আর অমনি পড়-পড় মড়-মড় করে দেয়াল ভেঙে, জানলা ভেঙে, নীচের রাস্তা অবধি দিব্যি একটা সাঁকোর মতো হয়ে গেল। আমি আর অপেক্ষা করলাম না, অমনি পড়ার ব্যাগটা বগলে পুরে এক দৌড়ে নেমে এলাম। হাতির লাইন সুদ্ধু হাইদার ততক্ষণে হাওয়া। কোথাও ওদের দেখতে পেলাম না।

আমি ছুটে মোড়ের মাথায় গিয়ে বাস ধরলাম। যখন বালিগঞ্জে আমাদের বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন হয়তো রাত নটা, বাবাদের খাবার দিচ্ছিল। আমাকে দেখে বাবার চক্ষু চড়কগাছ। মা হয়তো বকবেন বলে তৈরি হচ্ছিলেন, আমি ছুটে গিয়ে বাবার কোলে মুখ গুঁজে কেঁদেকেটে একাকার করলাম।

আমার গলার আওয়াজ শুনে বুল্টিও ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কিছুতেই আর গেল না, বলল, "আমি সেরে গেছি, কেন যাব?" বলে হাউমাউ করে সেও বাবার কোলে মুখ গুঁজে কান্না জুড়ে দিল। ভারী ছিঁচকাঁদুনে হয়েছে মেয়েটা।

ঠিক তখনি আমাদের জন্য পুতুল, হকিস্টিক, বেলুন, মুড়ি-ল্যাবেঞ্চুশ, শোনপাপড়ি নিয়ে জ্যাঠামশাই এলেন। আমরা বাবার গেঞ্জিতে চোখটোখ মুছে ফেললাম।

অনেক রাতে বাবার পাশে শুয়ে ঘরে বন্ধ থাকার কথা, হাইদার আর মোতি হাতির কথা বাবাকে বললাম।

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, "তোর জ্যাঠা-মশাই যখন তোর মতো, আমি একটু ছোট, আমাদের মা-বাবা বর্মা থেকে আসার পথে জাহাজসুদ্ধ নিখোঁজ হয়ে যান। ঐ ঘরে আমরাও মাস তিনেক ছিলাম। বড় দুঃখেকষ্টে ছিলাম রে। তখনো রোজ রাতে হাইদার আসত, হাতির সারি নিয়ে। আমাদের ফলটল খেতে দিত। একদিন হঠাৎ বলল, কাল তোমাদের মা-বাবা আসবে দেখো। ওমা, সত্যিই তাই। ঝড়ে পড়ে জাহাজ আসতে দেরি হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল জাহাজডুবি হয়েছে। আরো কিছুদিন ছিলাম ঐ বাড়িতে, কিন্তু হাইদার আর হাতিরা আর আসেনি।"

আমি বললাম, "তোমরা কেন গলি দিয়ে পিলখানায় গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করলে না?"

বাবা আস্তে-আস্তে বললেন, "পিলখানা?" পিলখানা কোথায় পাব রে? সে তো আরো একশো বছর আগেই ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল।"

বললাম, "আর দেখনি, বাবা?"

বাবা বললেন, "না রে, শুধু দুঃখী লোকেরা ওদের দেখতে পায়।"

বিল্লি

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

কেলো-ভুলোর থাবড়া খেয়ে
বেজায় রকম চটে যেয়ে
বাঘের মাসী বিল্লি
এক লাফেতে পৌঁছে গেল
হাওড়া থেকে দিল্লি।
প্ল্যাটফরমে ঠ্যাং ছড়িয়ে
পান সাজলো জর্দা দিয়ে,
মুখের ভেতর পুরে দিল
আস্ত দুটো খিল্লি।
হঠাৎ শোনে হুক্কাহুয়া
চমকে ওঠে পিল্লি।
উঠল প্লেনে দৌড়ে গিয়ে
মুখটা ঢেকে ঘোমটা দিয়ে
আঁতকে ওঠে মেম-দিদিরা
বেজায় চেল্লাচিল্লি।

ছোট্ট দুটি হরিণছানা

কিছুদিন আগে আলিপুর চিড়িয়াখানা আলো করে জন্মেছে দুই হরিণশিশু। কী সুন্দর দেখতে। টানা-টানা চোখ, জাপানী পাখার মতো কান, তুলতুলে গা, আর ওদের খুরগুলো দেখলে মনে হবে ঠিক যেন পুজোর বাহারে জুতো। জন্মাবার অল্প পরেই ওরা বড়-বড় চোখ মেলে অবাক হয়ে দেখতে লাগল চারদিক। চারদিকে কত গাছগালা, সবুজ ঘাস-ভর্তি মাঠ। ওদের মা ওদের আদর করে বলল, "তোমরা আর একটু বড় হলেই এই মাঠে ছুটে-ছুটে খেলা করবে, সবুজ-সবুজ ঘাস খাবে, আর রোদ্দুর খুব চড়া হলে গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াবে, কেমন?" তাই না শুনে ওরা দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মা, এই দেখ, আমরা এখনই বড় হয়ে গেছি, আমরা হাঁটতে পারি, দেখবে? আমরা ছুটতে পারি, দেখবে?" বলতে-বলতে একজন কিছুটা এগিয়ে গেল। তাই না দেখে আর একজনও টলমল করে হেঁটে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একজন দুষ্টু-দুষ্টু মুখ করে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী মা, বলেছিলাম না বড় হয়ে গেছি?" মা একটু হেসে বলল, "তাই তো।"

ছবি তুলেছেন তপন দাশ

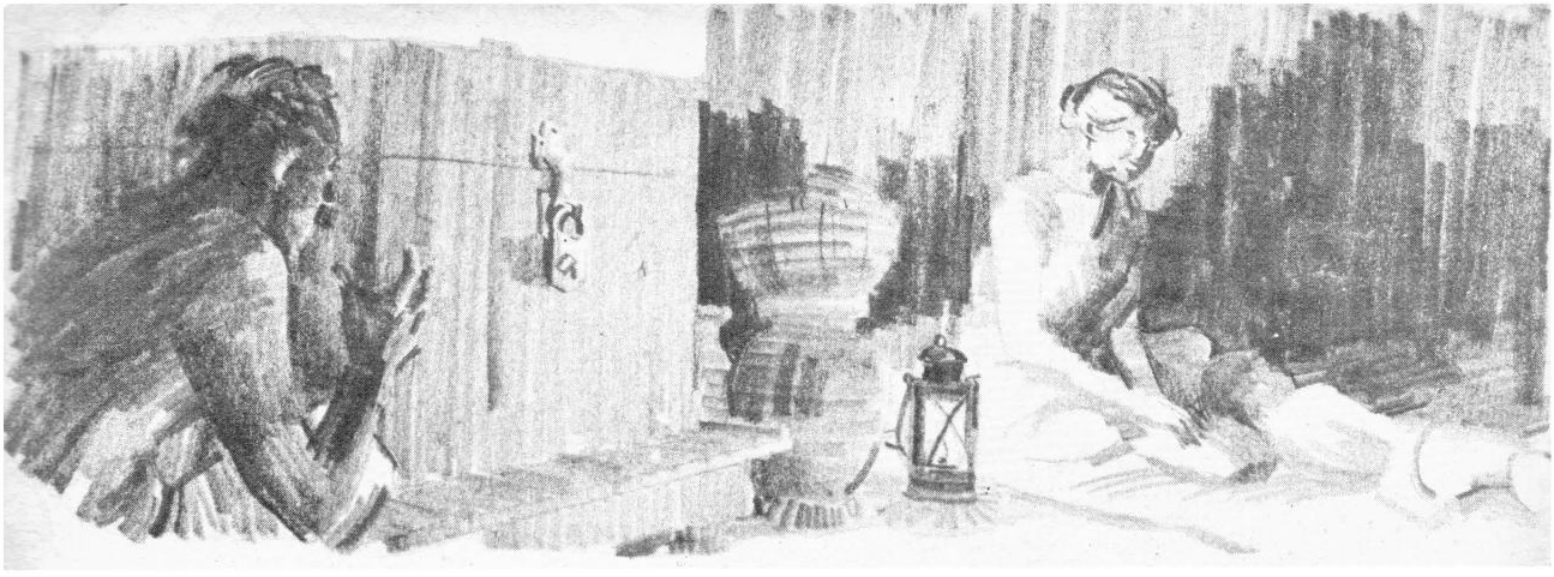

চোর ধরা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

রাত তখন দশটা-এগারোটা হবে। কিন্তু পাড়াগাঁর রাত—সব কিছু চুপচাপ, সুনসান্। কালিকাপুরের সমস্ত ঝোপঝাড় থেকে ঝিঁঝি ডেকে চলেছে একটানা, পাঠশালার দাওয়ার বুড়ো অশত্থ-গাছটার প্যাঁচাগুলো হুম্ হুম্ করে শব্দ করছে। পথঘাটে কোনো লোকজন নেই। কোনো কোনো বাড়ির জানলায় রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছে, কোনো কোনো বাড়ি একেবারে অন্ধকার।

গোবিন্দ ঘোষালের বাড়িতে তখনো কাজপাট চুকে যায়নি। গোবিন্দবাবু সেই কবে মারা গেছেন, কিন্তু ওঁর বাড়ি এখনো গোবিন্দ ঘোষালের বাড়ি বলেই পরিচিত। গোবিন্দ ঘোষালের ছেলে মুকুন্দ জরিপের কাজে বাইরে গেছে—বাড়িতে তখন শুধু ওর বুড়ি মা, স্ত্রী, আর তিন বছরের ছেলে চন্দন। স্ত্রী মনোরমা হেঁসেল পরিষ্কার করছে তখন—বাইরে থেকে ঠুং ঠাং, ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ শব্দ ভেসে আসছে। মনোরমার শাশুড়ি নীরবালা নাতিকে কোলে শুইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন বাইরের ঘরে বসে, আর বিড় বিড় করে গান গাইছেন :

রাতের ঘুম, রাতের ঘুম,
চাঁদুর চোখে আয়—
লাল-হলুদ জামা আছে
এখন চাঁদুর গায়।

চন্দন যখন প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন নীরবালা ঘরের কোণের দিকে তাকিয়ে দেখেন—ওমা, একী! কাঁঠাল-কাঠের সিন্দুকটার পেছনে চুপ করে বসে আছে দশাসই ডাকাতের মতো একটা চোর। চোরকে দেখে নীরবালা প্রথমে তো একেবারে ভয়ে সিঁটিয়ে গেলেন। বাড়িতে মুকুন্দ নেই, কোনো পুরুষ মানুষ নেই—শুধু দুজন মেয়ে, আর একটা ছোট্ট ছেলে। এই অবস্থায় চোরটা তো জোর করেই সব কেড়ে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া, চোরটার যা ষণ্ডামার্কা চেহারা! একটু পরে, ঘুমন্ত চন্দনকে পাটিতে শুইয়ে দিয়ে নীর-বালা উঠে দাঁড়ালেন। রান্নাঘরের কাছে গিয়ে ডাকলেন, "বৌমা তোমার কাজ শেষ হয়েছে? একটু শুনে যাও তো!"

"দাঁড়ান, যাচ্ছি।" বলেই, মনোরমা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল, "কী!"

"না, বলছিলাম," নীরবালা আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন "বেয়াইয়ের কোনো চিঠি পেয়েছ শিগগিরি?"

"কই, না তো! কেন?" মনোরমা একটু বিস্মিতভাবে ওর শাশুড়ির দিকে তাকাল।

"না, এমনিই বলছিলাম," নীরবালা কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন, "যাও তুমি হেঁসেলের কাজ শেষ করে এস। চাঁদু ঘুমিয়ে পড়েছে।"

মনোরমা রান্নাঘরে যেতে না যেতেই নীরবালা আবার ডাকলেন বৌকে, "বৌমা, একটু শুনে যাও তো।"

মনোরমা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে বলল "আপনি কি আমাকে হেঁসেলের কাজ আর করতে দেবেন না! এত ডাকাডাকি করছেন কেন?"

নীরবালা একটু চিন্তিত মুখে বললেন, "আচ্ছা, বেয়াইয়ের শরীর-টরির ভাল আছে তো!"

মনোরমার একটু সন্দেহ হল এই কথা শুনে। শাশুড়ি বার-বার ওর বাবার কথা জিগ্যেস করছেন কেন? নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে। কাঁদো-কাঁদো গলায় মনোরমা বলল, "কী হয়েছে মা? বাবার শরীরের কথা কেন হঠাৎ?"

"না, বয়স হয়েছে তো বেয়াইমশাইয়ের," নীরবালা বললেন, "তাই জিগ্যেস করছিলাম।"

"আপনি একটা কিছু চেপে যাচ্ছেন মা, আমি স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি। সব খুলে বলুন আমাকে।" প্রায় আর্তনাদ করে উঠল মনোরমা।

নীরবালা চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে বললেন "তোমাকে আজ জানাব না ভেবেছিলাম, দুপুরের ডাকে একটা চিঠি এসেছে, তাতে—"

"বলুন, বলুন," কঁকিয়ে উঠল মনোরমা।

"বেয়াইমশাই আর নেই, পরশুদিন ভোরে—"

নীরবালার কথা শেষ না হতেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল মনোরমা : "বাবা, বাবা, তুমি কোথায় গেলে? ওমা আমার কী হবে গো ; শেষ দেখাটাও দেখতে পারলাম না।"

মায়ের কান্না শুনে চন্দনও তখন উঠে পড়েছে, আর উঠে পড়েই ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে ঘোষাল-বাড়িতে একটা হৈহৈ ব্যাপার। মনোরমা কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে সামনের দাওয়ায় লুটিয়ে পড়ল, আর শুয়ে শুয়েই চ্যাঁচাতে লাগল, "আমার কী হবে গো?"

মনোরমার চিৎকার শুনে আশেপাশের বাড়ির অনেক লোকজন ছুটে এল। পাঁচ ছজন লোক আসতেই, নীরবালা হাসিমুখে সিন্দুকের দিকটা দেখিয়ে দিলেন। তারপর চোর-বাবাজীর কী অবস্থা হল, তা তো তোমরা বুঝতেই পারছ।

ছোটদের ছবি

তোমাদের দেখলে হিংসে হয়। আমরা যখন ছোট ছিলাম, ছবি আঁকার কী ইচ্ছেটাই না হত। আঁকতামও মাঝে মাঝে অঙ্কর খাতার পাতা ছিঁড়ে, কিন্তু বাবা-মা কিংবা মাস্টার মশাইয়ের কাছে ধরা পড়ে গেলে আর রক্ষা ছিল না। পড়াশোনা না করে ছবি আঁকা? কিন্তু এখন? বাবা-মায়েরা নিজেরাই ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন 'সিট অ্যান্ড ড্র' প্রতিযোগিতায়; ছেলেমেয়েরা পুরস্কার পেলে কতই না তাঁদের আনন্দ!

সম্প্রতি ছোটদের আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আরট্স-এ। ফিলিপস ইণ্ডিয়ার প্রচার বিভাগ এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। ফিলিপস ইণ্ডিয়ার পক্ষে সিট অ্যান্ড ড্র প্রতিযোগিতা সম্ভব নয়, কারণ এঁরা ব্যাপারটা করেন সর্বভারতীয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লি, পুনা প্রভৃতি শহর থেকে এসে ছোট-ছোট শিল্পীদের বসা তো আর সম্ভব নয়. তাই তাঁরা ডাকে কিংবা বাহক মারফৎ ছবি আনিয়ে বিচার করেন, কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ। অনেক মজার মজার ছবি জমা পড়েছিল। আর, ছবি আঁকার মানও, অন্য সব প্রতিযোগিতায় যেমন দেখা যায়, তার থেকে মোটেই 'নিচু নয়'। দু-একটা ছবি অসাধারণ।

তোমরা অনেকেই ওস্তাদ ছবি আঁকিয়ে। প্রাইজ পেতে হয় কী করে, তোমাদের বলে দিই। যা আঁকবে, নিজেরা আঁকবে। নকল করবে না আর বড়দের তোমাদের ছবির ওপর হাত লাগাতে দেবে না। যদি নকল করো, তাহলে তো যার ছবি নকল করেছ তার বাহাদুরি, আর যদি অন্যকে দিয়ে আঁকাও তাহলে যে এঁকেছে প্রশংসা তার প্রাপ্য, তোমার নয়—সবসময় এই কথাটা মনে রেখো।

অহিভূষণ মালিক

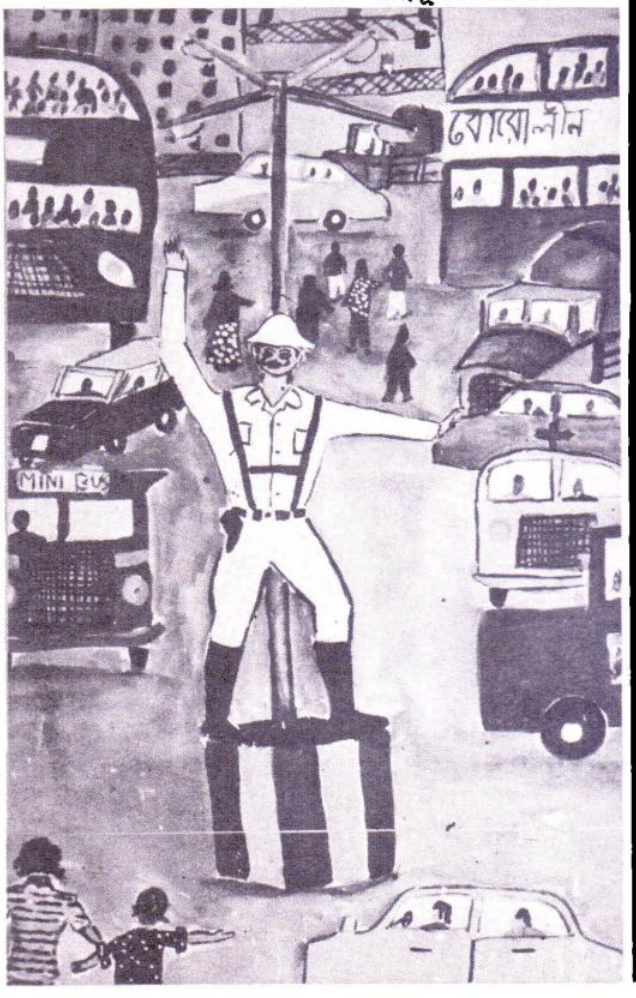

শব্দ-সন্ধান

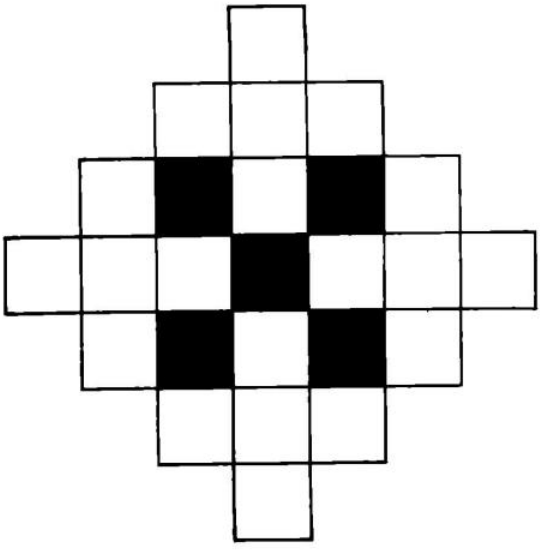

আশ্বিনে করা হয়েছিল 'ঐতিহাসিক' শব্দ-সন্ধানের ব্যবস্থা। কার্তিকের শব্দ-সন্ধান ছিল 'ভৌগোলিক'। ইতিহাস আর ভূগোল যারা ভাল জানো, গত দু মাসের শব্দ-ছক তারা টকাটক ভরাট করে ফেলেছ নিশ্চয়।

এবারে রাবীন্দ্রিক শব্দ-সন্ধানের ব্যবস্থা করেছি। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার বইয়ের নাম দিয়ে শূন্য স্থান পূর্ণ করতে হবে। দরকার হবে মোট আটটি নামের। সেই নামগুলি তোমরা চটপট খুঁজে বার করো। বলা বাহুল্য, পাশাপাশি আর উপর-নীচে নামগুলিকে এমনভাবে সাজাবে, ছকটা যাতে ঠিকঠাক মিলে যায়।

(সমাধান আগামী সংখ্যায়)

গতবারের সমাধান

পা	ট	না		দি	নে	মা
না		ঘা		ল্লি		ও
মা	ণ্টা		সি		পু	রী
		টো	কি	য়ো		
বা	কু		ম		ঢা	কা
হা		লা		প্রা		ম্পা
মা	ই	সা		গ	ণ্ডো	লা

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
ওই বেরোবার পথ ! দিনের আলো ! তাড়া-তাড়ি এসো, টারজান !
কিন্তু প্রহরী নেই কেন ? ব্যাপার কী ? এত বালিই বা এখানে ঢেলে রেখেছে কীজন্যে ?
পিছনে দ্যাখো ! সর্বনাশ !
উঃ, বালিতে পা ডুবে যাচ্ছে
দৌড়োও ! ধার ঘেঁষে ছোটো !
লা !
দাঁড়াতে পারছি না !
রাক্ষুসে পোকা !
উঃ !
এ কী, কে বালি ছুঁড়ছে ?
ডুবে যাচ্ছি !

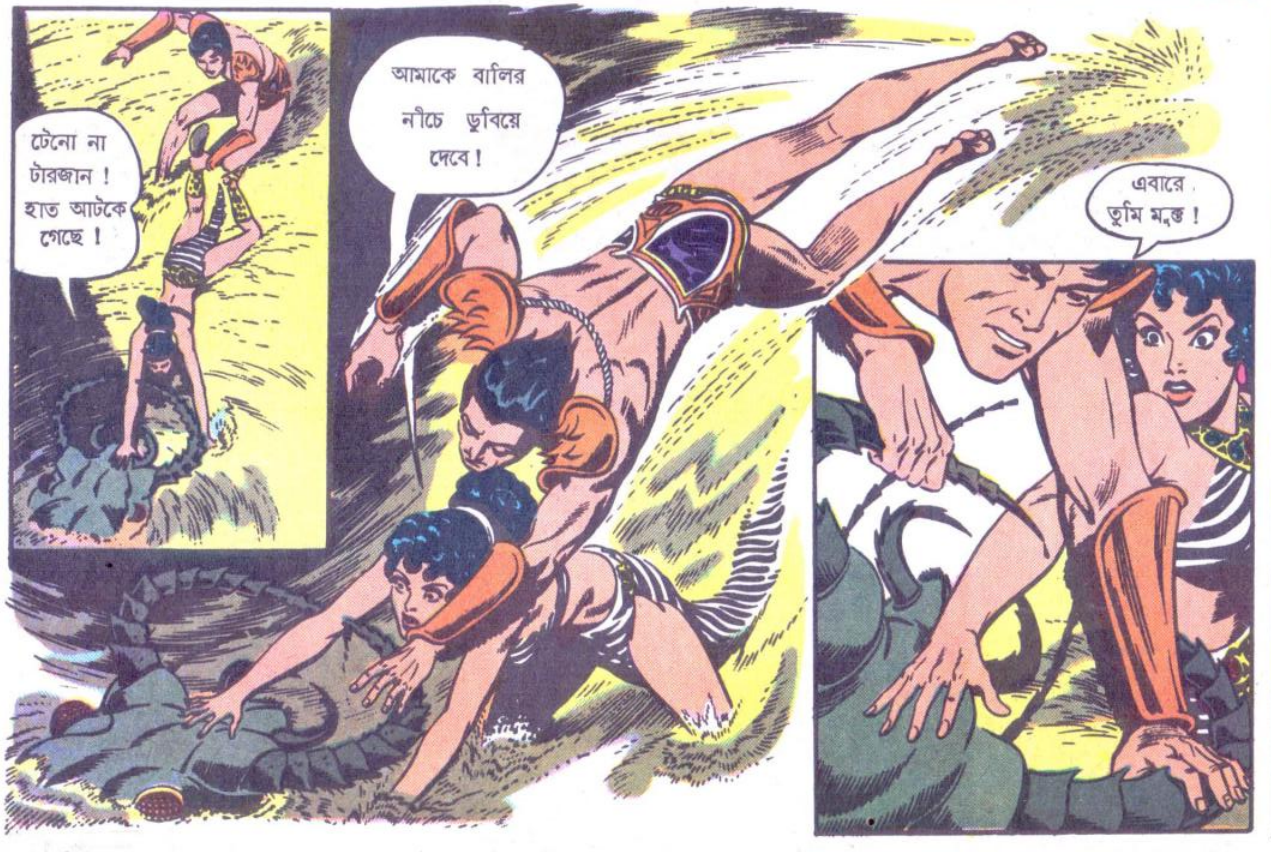

(এর পর আঠারোর পাতায়)

মাসটা অগ্রহায়ণ

দিদিমণি

কার্তিক থেকেই হেমন্তের শুরু। এখন পুরো হেমন্তকাল। না-শীত না-গ্রীষ্মের দিন ফুরিয়ে এখন শীতের পাল্লাটাই যেন ভারী ভারী ঠেকে। ঋতু পরিবর্তনে আচমকা ঠাণ্ডা লেগে সর্দিকাশি গলাব্যথা হয়। স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা চলছে, তাই আশে পাশে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে এখন মন নেই, এখন শুধু পড়া আর পড়া, আর তারই মধ্যে-মধ্যে কল্পনা করা, পরীক্ষার পর কী কী মজা করা যাবে, কত ঘুমোনো যাবে এই সব। এরই মধ্যে পড়তে পড়তে অজানতেই কখন চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। কোথা থেকে সারা চোখে যেন রাজ্যের আলসেমি এসে জড়ো হয়। তবু দিন গড়াতে-গড়াতে স্কুলের পরীক্ষাও একদিন শেষ হয়। তখন চারিদিকে তাকিয়ে হঠাৎ আশ্চর্য লাগে—প্রকৃতি কত বদলে গেছে। সন্ধে হতে-না হতেই একটা ধোঁয়া-মেশা কুয়াশার চাদর যেন সারা পৃথিবীকে ঢেকে ফেলে। আকাশের তারা যেন সেই চাদরের তলায় মুছে মুছে আসে। দিন এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে—বিকেল হতে-না-হতেই সন্ধে নেমে আসে।

অঘ্রান মাসে শহরে কোন পুজো-পার্বণ না-থাকলে কী হবে, গ্রামে এই সময় ধান পাকে, ধান কাটা হয়। ক্ষেতে-ক্ষেতে কৃষকদের মধ্যে কী দারুণ ব্যস্ততা। ব্যস্ততা গ্রামের ঘরে-ঘরে।

অঘ্রানে গাছের পাতা হলুদ হয়ে বুড়িয়ে যায়। কিছু-কিছু গাছের পাতা ঝরাও শুরু হয়ে যায়। যে-সব গাছে পাতা থাকে, তার উপরেও পড়ে যায় একটা ধুলোর পুরু আস্তর। মনে হয় অনেক দিন যেন ওরা স্নান করেনি। এখন ফুলের মধ্যে আছে কুন্দ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা বা ক্রিসানথিমাম আর কিছু কিছু রংবাহারী বিলিতী মরসুমী ফুল। অঘ্রান মাসে নতুন গাওয়া পড়বার সুখের সঙ্গে আরেকটা সুখও আছে—নতুন শাক-সবজি খেয়ে মুখের স্বাদ বদলানোর সুখ। একঘেয়ে কুমড়ো, পটল আর ঝিঙের ঝাঁকার বদলে এখন বাজারে নতুন ওঠা ফুলকপি, টোম্যাটো, গাজর, বীট, মটরশুটি, কচি বেগুন মুলো আর পালং শাকের ঝুড়িও দেখা যায়।

রাত্তিরে ধোঁয়াটে আকাশের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ছায়াপথ এখন আকাশের প্রায় মাঝখান দিয়ে পূর্ব থেকে সোজাসুজি পশ্চিমে চলে গিয়েছে। পশ্চিম আকাশ থেকে ধনু রাশি ক্রমশই দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাচ্ছে, পূর্ব আকাশে রোহিণী আর আর্দ্রাকে সঙ্গে নিয়ে সবে দেখা দিয়েছে কালপুরুষ আর ছায়াপথের উত্তরপূর্ব কোণ ঘেঁষে উঁকি মারছে মিথুন রাশি। সব মিলিয়ে মনে হয়, অঘ্রান এমনই একটা মাস, যার প্রথম পনরো দিনে আছে কেমন-যেন একটা আলসেমি আর দুঃখ-দুঃখ ভাব, আর শেষ পনরো দিনে আছে এমনই একটা শক্তি যা এনে দেয় পিকনিক, ক্রিকেট ম্যাচ বা নতুন কিছু করবার একটা দারুণ উৎসাহ।

মৎস্য-বৃষ্টি

মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি থেকে আমরা জল পাই। কখনও-কখনও তোমরা শিলাবৃষ্টিও পড়তে দেখেছ। বৃষ্টির সঙ্গে ছোট-বড় বরফের টুকরো পড়লে তাকে শিলাবৃষ্টি বলে।

কিন্তু আকাশ থেকে যদি বৃষ্টির সঙ্গে ঝুপঝুপ করে মাছ অথবা ব্যাং পড়তে থাকে তাহলে খুব মজা হয় তাই না? তুমি হয়ত মনে মনে ভাবছ সোনার পাথরবাটির মতো কথা বলছি আমি, আকাশ থেকে সত্যি-সত্যি কি আর কখনও কোনও জীব পড়তে পারে? কিন্তু বিশ্বাস কর, একথা একেবারে খাঁটি সত্যি—মাছ, ব্যাং অথবা পোকামাকড়ও আসমান থেকে মাঝে মাঝে বৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে পড়ে থাকে।

মৎস্য-বৃষ্টির কথা প্রথম বলছিলেন এথেনীয়রা, আজ থেকে প্রায় দু হাজার বছর আগে। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে লুকাস ডেবিস নামে একজন ভদ্রলোক তাঁর লেখা একটা বইতে ফারো দ্বীপের অনেক মজার কথা লিখেছিলেন। ঐ দ্বীপের প্রায় চারশো ফুট উঁচু এক পাহাড়ের উপর থেকে একবার প্রচুর মৎস্য-বৃষ্টি হয়েছিল—তা নাকি তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা অনেক সময় সমুদ্র, নদী অথবা পুকুরের জলকে উপরে তুলে নিয়ে আসে। ঐ জল-স্তম্ভের সঙ্গে ওর মধ্যেকার মাছেরাও আকাশে উঠে আসে। আর বৃষ্টি আরম্ভ হলে সব্বাইকে অবাক করে দিয়ে ঝুপঝুপ করে তারা মাটিতে পড়তে থাকে।

আকাশ থেকে যে মৎস্যবৃষ্টি হয়, ইউরোপের লোকেরা অনেক আগে সেকথা জানত। ১৬৬৬ থেকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকার লেখায় সে খবর পাওয়া যায়।

অবশ্য সবচাইতে বেশী মৎস্য-বৃষ্টি হয়েছিল সিঙ্গাপুরে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে—প্রায় পঞ্চাশ একর জমির উপরে। বিখ্যাত প্রকৃতিতত্ত্ববিদ ফ্রান্সিস ক্যাসটিলান একথা লিখে গিয়েছেন।

যদিও হাজার হাজার বছর আগেই মৎস্য-বৃষ্টির ঘটনা লোকেরা জেনেছিল, তবু বিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীল বিজ্ঞানীরা খুব সহজ মনে এটাকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা বললেন, প্রমাণ চাই, কেবল পুঁথিতে লেখা থাকলেই তা সব সময় সত্যি হয় না। অবশেষে প্রকৃতি দেবী একদিন ১৯৪৭ সালের তেইশে অক্টোবর সব সন্দেহ নিরসন করে বিজ্ঞানী ডক্টর বাজকভের একেবারে চোখের সামনে মৎস্য-বৃষ্টি করালেন। কেবল একটা-দুটো নয়—হাজারে হাজারে বরফের মতো ঠাণ্ডা অথচ তাজা মাছ রাস্তায়, মাঠে-ঘাটে, বাড়ির ছাদে, আনাচে-কানাচে পড়ল। এই মৎস্য-বৃষ্টি যেদিন হয়েছিল সেদিন আবহাওয়া ছিল খুব শান্ত। কিন্তু তার আগের দিনই অনেকগুলি প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা ঐ অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। এখানে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ সেটা কাঠের উপর খোদাইকরা মৎস্য-বৃষ্টির এক অনুপম শিল্প-নিদর্শন। এটা তৈরি করেছিলেন সুইডেনের আপসালার আর্চ-বিশপ ওলাস ম্যাগনাস ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে।

মৎস্য-বৃষ্টি ছাড়া আকাশ থেকে অজস্র ব্যাং, ব্যাঙাচি, নানা-রকম পাখি, পিঁপড়ে, মাকড়শা ও অন্যান্য পোকা-মাকড়ও বৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে পড়েছে—এমন কথাও শোনা গেছে।

যা মাছের দাম বাজারে—তাতে যদি আমাদের কলকাতায় মাঝে-মাঝে মৎস্য-বৃষ্টি হয়, তাহলে খুব ভালো হয়—তাই না?

বানাও

মূল ভাঁজ শিখে নিলে সাত পাখি এক ঢিলে

এক ঢিলে দুটো পাখি মারার কথা তোমরা জান। কথায় কথায় বলি আমরা। কিন্তু আমি এমন ম্যাজিক জানি যাতে একসঙ্গে সাতটা পাখিও মারা যাবে। যদি বাজি রাখো, মেরে দেখাতে পারি। কী বলছ? গুলতি দিয়ে? না ভাই, গুলতি-টুলতি আমার নেই। সে ছিল ছেলেবেলায়। ছেলেবেলার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে। আমি যে ঢিলে পাখি মারব, সেটা কাগজের তৈরী। কাগজকে ভাঁজ-ভোঁজ করে বানানো। আসল কথাটা তাহলে খুলে বলি। কাগজ ভাঁজ করার একটা বিশেষ কৌশল জানা থাকলে, সেই ভাঁজটাকে একটু অদল বদল করে অনেক আলাদা আলাদা পাখি বানানো যায়। চড়ুই বানাতে চাও, চড়ুই। বক বানাতে চাও, বক। মুরগী বানাতে চাও, মুরগী। বেশী কষ্ট বানালে বাড়িতে একটা পোলাট্রিই গড়ে তুলতে পারো রাতারাতি। তারপর ধর কারুর উপর রাগ আছে। দিনদুপুরে তার বাড়িতে গিয়ে চরিয়ে আসতে পারো ঘুঘু। ফিঙে নাচাতে চাও, ফিঙে। পায়রা ওড়াতে চাও, পায়রা। এসবেও যদি মন না ভরে, তাহলে বানাতে পারো ময়ূর। সাত রঙের পেখমশুদ্ধ। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বেশ তাহলে কৌশলটা শিখিয়ে দি।

পূর্ণেন্দু পত্রী

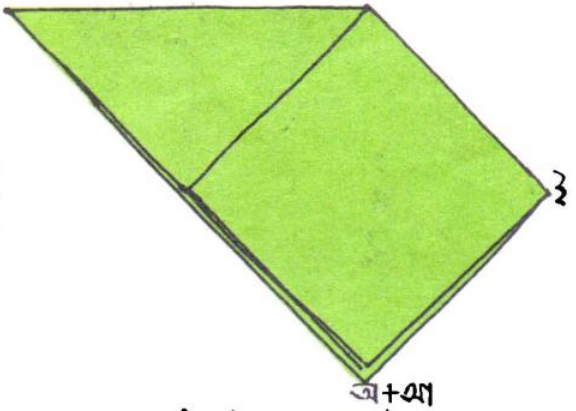

এবার পিছনটাও মুড়ে নাও ঐভাবে।

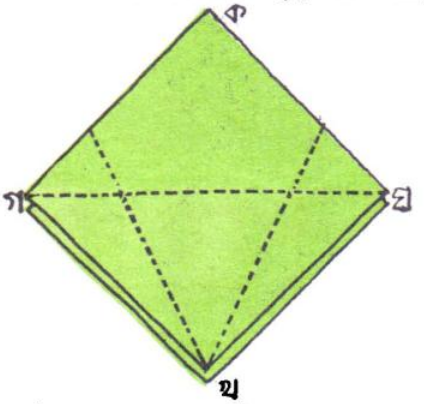

ভাঁজের দাগ ধরে খ কোণটাকে টেনে তুলে ক-এর সঙ্গে মিলিয়ে দাও। এবং গ আর ঘ কোণ-দুটোকে ভাঁজের দাগে মুড়ে পাশাপাশি নিয়ে এসো।

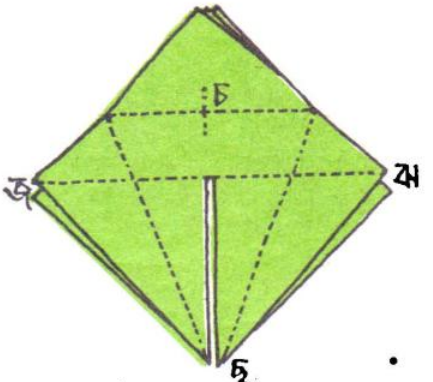

এবার চ ভাঁজের কাছে আঙুলের আলতো চাপ দিয়ে, তলা থেকে ভাঁজের পেটের ভিতরে আঙুলের চাপ দিয়ে ছ কোণটাকে উপরে টেনে নিয়ে যাও। দেখবে জ আর ঝ কোণদুটো পাশা-পাশি এসে গেছে। এবং ঠিক ঐ ভাবেই পিছনটাকে মুড়ে নাও।

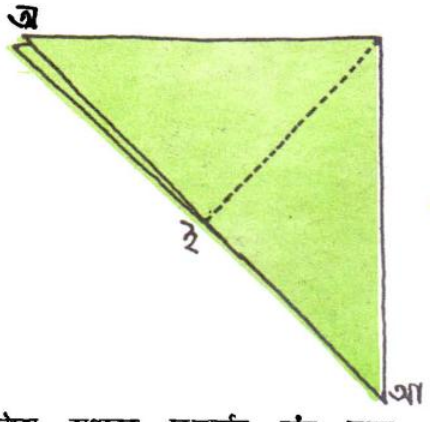

চৌকো কাগজকে কোনাকুনি ভাঁজ করলে, ত্রিভুজ।
সেটাকে আবার ভাঁজ করো। আবার ত্রিভুজ।
এবার ভাঁজের দাগ দেখে এ কোণটাকে টেনে এনে জুড়ে দাও এা কোণের সঙ্গে। দেখতে হবে এইরকম।

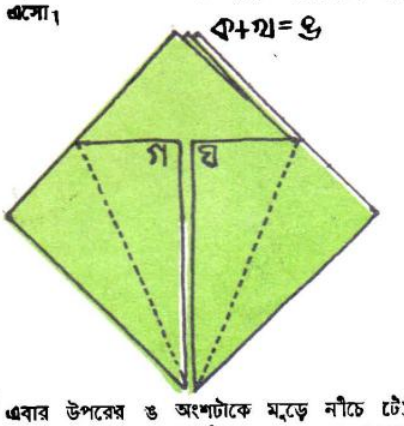

এবার উপরের ও অংশটাকে মুড়ে নীচে টেনে আনো। এবং সমস্ত ভাঁজ খুলে দাও। কাগজে ভাঁজের দাগগুলো রয়ে যাবে।

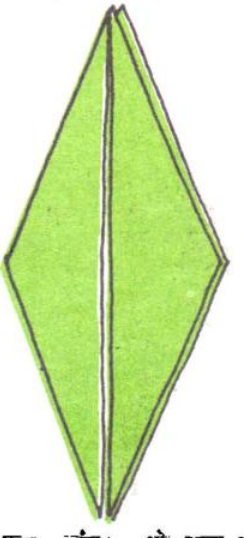

এই হল মূল ভাঁজ। এটা জানা থাকলে এক ঢিলে মারতে পারবে সাতটা পাখি। যখন যেমন খুশি।

(পনরোর পাতার পর)

রাক্ষুসে পোকা বালি ছুঁড়ছে ! টারজান আর লা'কে যারা ধরতে এসেছিল, বালির ঝড়ে তারা দিশেহারা !
কিছু দেখতে পাচ্ছি না টারজান !
ওরাও দেখতে পাচ্ছে না। পালাবার এই মস্ত সুযোগ !
দৌড়োও, লা !
প্রহরীদের কাবু করবার এই সুযোগ !
পোকাটা, উপকারই করল !
লা নিশ্চয় এগিয়ে গেছে !
ওরে বাবা, কী উঁচু ! নীচে নামব কী করে ?

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

উপন্যাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সবুজ দ্বীপের রাজা

আগে যা ঘটেছে

'ভয়ংকর সুন্দর'-এর সেই সন্তু আর কাকাবাবু এবার অভিযানে এসেছেন আন্দামানে। এর আগে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে বৈজ্ঞানিকরা আন্দামানে এসে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এবারেও ওরা দেখেছেন, কয়েকটি সাহেব মোটরবোটে চেপে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে। এখানে একটা দ্বীপের জঙ্গলে জারোয়া নামের খুব হিংস্র আদিবাসীরা থাকে। বাইরের লোক দেখলেই তারা বিষাক্ত তীর মারে। সেখানে অন্যদের যাওয়া নিষেধ। তবু কাকাবাবু জোর করে সেই দ্বীপে নেমে পড়লেন। সন্তু বোট থেকে নেমে জলে ঝাঁপ দিয়ে কাকাবাবুর কাছে চলে এল। তারপর জঙ্গলের মধ্যে খুব সাবধানে এগোতে-এগোতে সন্তু কিসে যেন হোঁচট খেল একবার। নিচু হয়ে দেখল একজন মানুষ শুয়ে আছে। তারপর—

৮

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

সন্তু কোনো উত্তর দিল না। ভয়ে তার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

কাকাবাবুও এবার লোকটাকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রিভলবারটা উঁচিয়ে ধরলেন সেদিকে।

লোকটি কিন্তু একটুও নড়ল-চড়ল না, কোনো কথাও বলল না। শুধু খোলা দু' চোখে যেন কটমট করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

কাকাবাবু ঝুঁকে লোকটির গায়ে হাত দিয়েই বললেন, "এ তো মরে গেছে দেখছি!"

কাকাবাবু এবার লোকটির পাশে বসে পড়লেন। লোকটির গায়ে কোনো দাগ নেই, কোনো ক্ষত নেই, তা হলে মরল কী করে? লোকটার মাথার চুল নিগ্রোদের মতন, কুচকুচে কালো রং, হাত দুটো বেশ লম্বা, আর বুকখানা যেন মনে হয় পাথরের। এমন একটা জোয়ান লোক এমনি-এমনি মরে গেল?

কাকাবাবু লোকটাকে উল্টে দিলেন। তখন দেখা গেল, তার ঘাড়ের কাছে অনেকখানি রক্ত জমে আছে। সেখানে একটা গর্তের মতন।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "গুলি! এর ঘাড়ের মধ্যে গুলি ঢুকে গেছে। সর্বনাশ!"

সন্তু এত কাছ থেকে কোনোদিন কোনো মরা মানুষ দেখেনি। সে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটাও কথা বলতে পারছে না।

কাকাবাবু বললেন, "একে গুলি করে মেরেছে। তার মানে সেই সাহেবগুলোও এই দ্বীপে নেমেছে। আমি বলেছিলাম না? ওরা আমাদের আগে এসে পৌঁছে গেছে। সন্তু, আমাকে টেনে তোল্!"

কাকাবাবুর একটা পা কাটা বলে উনি একবার বসে পড়লে চট্ করে নিজে থেকে উঠতে পারেন না। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, সন্তু সেই হাত ধরে টেনে তুলল তাঁকে।

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের আবার চট করে লুকিয়ে পড়তে হবে। এখন আমাদের দু দিক থেকে বিপদ! জারোয়ারা দেখলে মারবে, আর সাহেবগুলো দেখলেও আমাদের ছেড়ে দেবে না!"

দু'জনেই একটা ঝোপের আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু দূরের একটা ঝর্নার জলের শব্দ ছাড়া। তবু মনে হচ্ছে যেন খুব কাছাকাছি কেউ দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ করছে। সব দিকে এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার যে, কিছুই দেখা যায় না। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

সন্তুর গলাটা একদম শুকিয়ে গেছে। জলতেষ্টায় মনে হচ্ছে যেন বুকটা ফেটে যাবে। ঘাড়ের কাছে অনবরত কটা মশা কামড়াচ্ছে। একবার সে চটাস করে মশা মারল।

কাকাবাবু বললেন, "উঁহুঃ! শব্দ করো না।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আমি জল খাব।"

কাকাবাবু বললেন, "আমারও জলতেষ্টা পেয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকেও তো কিছু লাভ নেই। চলো, আমরা আস্তে আস্তে ঝর্নাটার দিকে এগোই!"

অন্ধকারে কোথায় পা পড়ছে, তা বোঝবার উপায় নেই। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখে নিতে হচ্ছে সামনে কোনো বড় গাছ আছে কিনা। তাও গাছে মাথা ঠুকে গেল কয়েকবার। কাকাবাবুর ক্রাচটা প্রায়ই জড়িয়ে যাচ্ছে বুনো লতায়, সেগুলো টেনে-টেনে ছিঁড়তে হচ্ছে।

বেশ খানিকটা যাবার পর ঝর্নাটা চোখে পড়ল। এখানে গাছপালা কিছু কম বলে চাঁদের আলো এসে জলে পড়েছে, তাই অন্ধকার এখানে পাতলা। ঝর্নাটা বেশ চওড়া, জলে স্রোত আছে।

এতক্ষণ অন্ধকারে থেকে বিচ্ছিরি লাগছিল, তাই সন্তু দৌড়ে চলে গেল ঝর্নাটার কাছে। ঝর্নার ধারে বালি ছড়ানো, বেশ ঝকঝকে, পরিষ্কার। সন্তু জলের মধ্যে এক পা দিয়েই আবার উঠে এল তাড়াতাড়ি। এত জোর স্রোত যে, তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। সে উবু হয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে চুমুক দিয়ে জল খেয়ে নিল খানিকটা। জলটা ঠাণ্ডা নয়, একটু-একটু গরম, আর স্বাদটাও কষা-কষা। তবু পেট ভরে জল খেয়ে নিল সন্তু। সারা দিন কিছুই খাওয়া হয়নি। এতক্ষণ খিদের কথা মনেই পড়েনি।

কাকাবাবু ঝর্নার ধারে বসতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। জলের মধ্যে গিয়ে পড়ার আগেই সন্তু তাঁর পিঠের জামা টেনে ধরল। তাতে কাকাবাবু নিজেকে সামলে নিতে পারলেন বটে, কিন্তু একটা সাংঘাতিক বিপদ ঘটে গেল। হুমড়ি খাবার সময় কাকাবাবুর ডান হাতের ক্রাচটা হাত

থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল জলে, আর অমনি স্রোতে সেটা ভেসে গেল। সন্তু ঝর্নার ধার দিয়ে খানিকটা দৌড়ে গেল তবু সেটাকে ধরতে পারল না, একটু পরেই একটা মস্ত বড় পাথর, সেটা ডিঙনো যায় না। ডান পাশ দিয়ে ঘুরে যখন আবার ঝর্নাটার কাছে এল, তখন ক্রাচটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সন্তু ফিরে আসতেই কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "পেলি না?"

"না।"

কাকাবাবু হতাশ ভাবে বললেন, "যাঃ, কী হবে এখন?"

ক্রাচ ছাড়া কাকাবাবু এক পা'ও চলতে পারেন না। বাঁ হাতেরটা রয়েছে বটে, কিন্তু একটা নিয়ে হাঁটতে গেলে একটু বাদেই বগলে দারুণ ব্যথা হয়ে যায়। এমনিতেই বিপদে পড়লে কাকাবাবু দৌড়তে পারেন না, এরপর যদি হাঁটতেও না পারেন, তা হলে কী হবে?

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইলেন। তারপর আঁজলা ভরে খানিকটা জল নিয়ে এলেন মুখের কাছে। প্রথমে একটু জিভ ঠেকিয়ে স্বাদ নিলেন, তারপর বললেন, "এটা একটা হট ওয়াটার স্প্রিং। কাছাকাছি কোনো জায়গায় পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়েছে। জলে অনেকটা গন্ধক আর লোহা মেশানো আছে। তাতে অবশ্য কোনো ক্ষতি হবে না, এ-জল খাওয়া যায়।"

সন্তুর হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন কাকাবাবু। তারপর সন্তুর কাঁধে ভর দিয়েই এগোতে লাগলেন। ঝর্নার ধার দিয়ে। একটু পরে বললেন, "কোনো গাছের ডাল ভেঙে একটা লাঠি বানিয়ে নিতে হবে অন্তত।"

সন্তু বলল, "আমি এক্ষুনি বানিয়ে দিচ্ছি।"

কাছেই একটা গাছের ডাল ধরে সে টান মারল। সেটা কিন্তু ভাঙল না। দারুণ শক্ত। সন্তু ডালটা ধরে ঝুলে পড়ল। সেটা নুয়ে পড়ছে, কিন্তু ভাঙছে না কিছুতেই।

কাকাবাবু বললেন, "ছুরি দিয়ে কাটতে হবে। এখানকার বেশির ভাগ গাছই প্যাডোক কিংবা সিলভার উড, খুব ভাল কাঠ হয়।"

সন্তুর পকেটে একটা ছোট্ট ছুরি আছে। তাতে বেশী মোটা ডাল কাটা যাবে না। তবু সে চেষ্টা করতে গেল, সেই সময় শুনতে পেল একটা অদ্ভুত শব্দ। কেউ যেন খুব জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। অনেকখানি রাস্তা দৌড়ে এলে যে-রকম নিশ্বাস পড়ে।

দুজনেই কান খাড়া করে শুনল আওয়াজটা। এক-একবার থেমে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। খুব কাছেই। শব্দটা লক্ষ করে এগিয়ে যেতেই দেখল একটা লোক শুয়ে আছে মাটিতে। তার দেহটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে, আর মুখটা বেরিয়ে আছে বাইরে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ঝর্নাটার দিকে আর ঐ রকম নিশ্বাস ফেলছে।

এর চেহারাও আগের লোকটার মতন, কিন্তু জ্যোৎস্নার আলোয় বোঝা যায়, এর সারা গায়ে রক্ত মাখা।

কাকাবাবু বললেন, "এর গায়েও গুলি লেগেছে। কিন্তু লোকটা এখনো বেঁচে আছে।"

ওরা গিয়ে লোকটার কাছে দাঁড়াল। লোকটা মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ওদের দিকে, সেই দৃষ্টিতে দারুণ ঘৃণা।

কাকাবাবু বললেন, "আহা রে, লোকটা গড়িয়ে গড়িয়ে

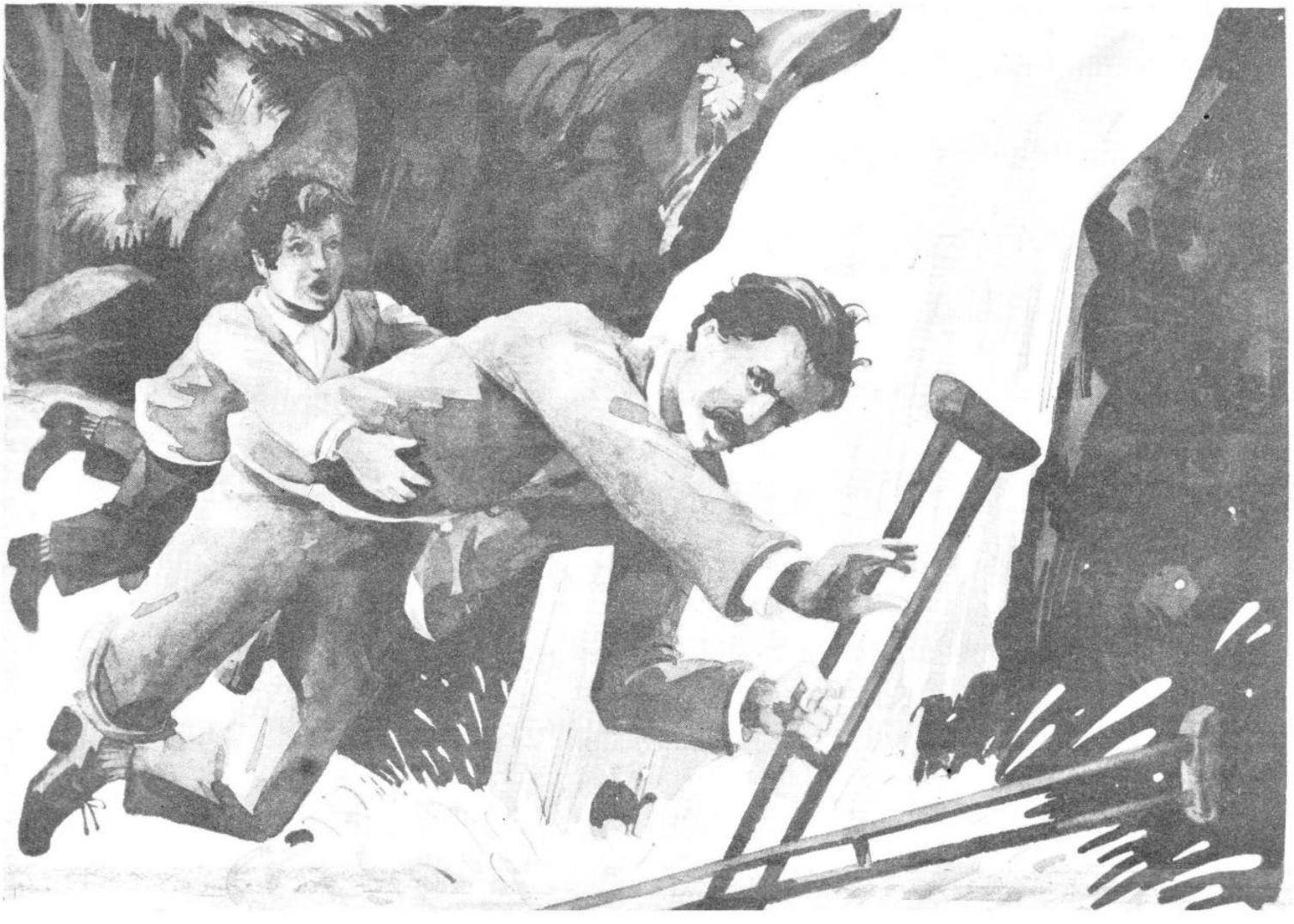

শিশুদের—কিশোরদের—যত ছোটদের বই

বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের সবচেয়ে নামী ঘরানার এখনকার সব সেরা ধারক-বাহকের নাম। টুনটুনির বই, সন্দেশ, আবোল তাবোল, হযবরল-এর ঐতিহ্যে নতুন অথচ স্থায়ী সংযোজন তাঁর অবিস্মরণীয় ফেলুদা ও প্রোফেসর শঙ্কু। এদের কীর্তিকলাপ-কাণ্ডকারখানার দারুণ দারুণ কতকগুলি বই :

সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫.০০
এক ডজন গপ্‌পো ৮.০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫.০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫.০০
সোনার কেল্লা ৬.০০
বাক্স-রহস্য ৫.০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫.০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬.০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫.০০
আরো এক ডজন ১০.০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২.০০

সরলাবালা সরকার
পিন্‌কুর ডাইরি ২.০০

পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪.০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪.০০
রসায়নের ভেল্‌কি ৩.০০

মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭.০০

শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩.০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪.০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬.০০
বাজনা ৫.০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫.০০
আমার নাম টায়রা ৫.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬.০০

নকুল মুখোপাধ্যায়
দেবতার পাহাড় ৩.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫.০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৪.৫০

পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫.০০
পাপুর বই ৬.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫.০০
পাথরের চোখ ৬.০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪.০০

ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫.৫০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৪.০০
সত্যি রাজপুত্র ৫.০০
তিন নম্বর চোখ ৫.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘন্টাদার কাবলু কাকা ৫.০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬.০০

পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪.০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪.০০

মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪.০০

বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫.০০

সুকুমার রায়
সমগ্র শিশু সাহিত্য ১০.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০.০০
জীবজন্তু ৮.০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীথ রাতের আহ্বান ৩.০০

গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩.০০

আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫.০০

বিমল কর
ওআওার মামা ৬.০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭.০০

মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬.০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪.০০

লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪.০০

অমরনাথ রায়
দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১০.০০

আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪.০০

সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫.০০

অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩.০০

ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ি ৪.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

এতটা এসেছে জল খাবার জন্য। আর এগোতে পারেনি। সন্তু, ওকে একটু জল এনে দাও তো!"

সন্তু আঁজলা করে খানিকটা জল নিয়ে এসে লোকটার মুখের ওপর ঢেলে দিল। লোকটা হাঁ করে আছে। যে-টুকু জল মুখের বাইরে পড়েছে, তা জিভ দিয়ে চেটে নিচ্ছে। সন্তু তিন-চারবার ওকে জল এনে এনে দিল। কাকাবাবু ততক্ষণে লোকটার পাশে বসে পড়েছেন।

লোকটার পেটে আর কাঁধে আর পায়ে তিনটে গুলি লেগেছে। এর মধ্যে পেটের জখমটাই সাংঘাতিক।

কাকাবাবু বললেন, "এখনো চেষ্টা করলে লোকটাকে বাঁচানো যায়।"

তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করে তুলোর মতন পেটের ক্ষতটাতে গুঁজে দিলেন। তারপর দু' পায়ের মোজা খুলে ফেলে সেগুলো ছিঁড়ে গিঁট বেঁধে ব্যান্ডেজ বানাতে লাগলেন।

সন্তু পাশে বসে আছে। হঠাৎ লোকটা একটা হাত তুলে সন্তুর গলা টিপে ধরল। সন্তু কিছু বোঝবার আগেই আঙুল-গুলো সাঁড়াশির মতন বসে গেল তার গলায়। লোকটার শরীর থেকে কতখানি রক্ত বেরিয়ে গেছে, তবু তার গায়ে অসম্ভব জোর। সন্তু দু হাত দিয়ে টেনেও লোকটার হাত ছাড়াতে পারছে না। তার দম আটকে আসছে, সে এবার মরে যাবে! সে কোনো শব্দ করতে পারছে না। কাকাবাবু অন্যদিকে ফিরে এক মনে মোজা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ বানাচ্ছেন, তিনি কিছু টেরও পেলেন না।

প্রাণপণ চেষ্টায় সন্তু একবার শব্দ করে উঠল, আঁ আঁ—

কাকাবাবু পেছন ফিরে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রিভলবারের বাঁট দিয়ে খুব জোরে মারলেন লোকটার হাতে। লোকটা হাত ছেড়ে দিল, সন্তু ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।

লোকটা তখন মুখখানা উঁচু করে কাকাবাবুর একটা হাত কামড়ে ধরল। কাকাবাবু সব কিছু ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন 'উঃ' করে! তারপর অন্য হাত দিয়ে রিভলবারের বাঁটটা ঠুকে দিলেন লোকটার মাথায়। লোকটার কামড় আলগা হয়ে গেল, ঘাড় কাত করে চোখ বুজল।

কাকাবাবু হামাগুড়ি দিয়ে ঝর্না থেকে জল এনে এনে ঝাপটা দিতে লাগলেন সন্তুর চোখ-মুখে। আর ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগলেন, সন্তু, সন্তু!

একটু বাদে সন্তু চোখ মেলল। তাড়াতাড়ি উঠে বসতে যেতেই কাকাবাবু বললেন, "থাক থাক উঠতে হবে না। একটু শুয়ে থাক। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু আবার হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে জল এনে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন সেই লোকটির মুখে। সে কিন্তু আর চোখ খুলল না।

কাকাবাবু বললেন, "লোকটা মরেই গেল নাকি ? আমি ওকে মেরে ফেললাম?"

তিনি লোকটার নাকের কাছে হাত নিয়ে বললেন, "না, এখনো নিশ্বাস পড়ছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে। থাক্।"

এবার তিনি লোকটার ক্ষত জায়গাগুলো মুছে দিলেন। কিছু লতাপাতা ছিঁড়ে রস লাগিয়ে দিলেন সেখানে। তার মোজার ব্যান্ডেজটা বেঁধে দিলেন পেটে। তারপর বললেন, "পেট থেকে যদি রক্ত পড়া বন্ধ হয়, তা বলে বেঁচেও যেতে পারে।"

সন্তু ততক্ষণে উঠে বসেছে। এখনো তার মাথা ঝিম-ঝিম করছে। সে ভেবেছিল সে মরেই যাবে। গলাটা ফুলে গেছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কেমন লাগছে? কষ্ট হচ্ছে?"

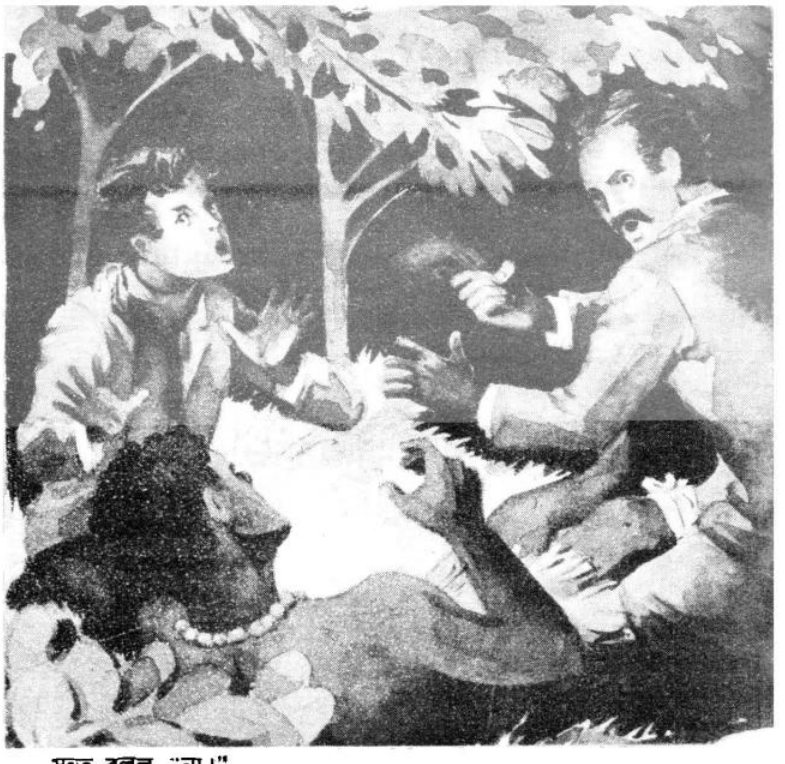

সন্তু বলল, "না।"

"বাবাঃ, কী সাংঘাতিক!"

সন্তু খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বলল, "আমি ওকে জল খাওয়ালাম, তবু ও আমাকে মারতে চাইল কেন? আমরা তো ওকে বাঁচাবারই চেষ্টা করছিলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা আমাদের বিশ্বাস করে না। বাইরের যে-কোনো লোকই ওদের কাছে শত্রু।"

"আমার আর এখানে একটুও থাকতে ভাল লাগছে না।"

"কাল সকালেই আমরা চলে যাব। পুলিশের বোট আসবে।"

"যদি না আসে?"

"আসবে না কেন? নিশ্চয়ই আসবে। ওরা কি আমাদের ভুলে যেতে পারে? আমরা রাত্তিরটাতে সারা দ্বীপটা একবার ঘুরে দেখে আসব। রাত্তিরেই সুবিধে। তারপর ভোরবেলা আমরা সমুদ্রের ধারে লুকিয়ে বসে থাকব। লঞ্চ এলেই উঠে পড়ব চট করে!"

এত রকম বিপদের পরও কাকাবাবু দ্বীপটা ঘুরে দেখতে চান। ওঁর উৎসাহ কিছুতেই কমে না। ভয়ডর একটুও নেই। একটা ক্রাচ নেই, নিজে হাঁটতে পারছেন না, তবু এখনো হেঁটে বেড়াবেন।

সন্তু বলল, "আমরা এখনি সমুদ্রের ধারে চলে যাই না কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ গোটা দ্বীপটা না-দেখেই চলে যাব? তা হলে এলাম কেন? সবটা না-দেখে ফিরব না!"

আবার তিনি সন্তুর কাঁধ ধরে হাঁটতে লাগলেন। ঝর্নার পাশ দিয়ে-দিয়েই। কারণ বালির ওপরটা বেশ পরিষ্কার। পায়ে লতাপাতা আটকে যায় না। জ্যোৎস্নায় সামনেটাও দেখা যায়।

তবু বেশী দূর আর এগোনো হল না। খানিকটা বাদে হঠাৎ দেখা গেল, বনের মধ্যে এক জায়গায় জ্বলে উঠল একটা টর্চের আলো।

কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে সন্তুকে এক ধাক্কা দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়লেন মাটিতে। গড়াতে-গড়াতে ঝর্নার ধার থেকে সরে গিয়ে ঢুকে পড়লেন একটা ঝোপের মধ্যে। সন্তুও চলে এল কাকাবাবুর পাশে-পাশে।

অমনি গুড়ুম-গুড়ুম করে দুটো গুলির শব্দ হল।

(ক্রমশ) ২৩

সেই বইটা

অজেয় রায়

বইটা প্রথমে দেখে ফেলেন পিণ্টুর মাস্টারমশাই। পিণ্টুকে গোটা-বারো অঙ্ক কষতে দিয়ে মাস্টারমশাই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে একটু চোখ বুজে ঝিমিয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হল, ছাত্রটি যেন বড় বেশী চুপচাপ। অনেক কষ্টে চোখের পাতা দুটো আধখোলা করে চেয়ে দেখলেন, পিণ্টু চোখ গোল গোল করে অঙ্কের বইয়ের ওপর উপুড় হয়ে কী যেন পড়ছে।

অ্যাঁ, অঙ্ক পড়ছে! মাস্টারমশাইয়ের সন্দেহ হল।

হাঁক ছাড়লেন, "পিণ্টু, বইটা দেখি।"

পিণ্টু চমকে উঠল। তার হাত থেকে পেনসিলটা ছিটকে পড়ল মেঝেয়। তারপর সে তাড়াহুড়োয় অঙ্কের বইয়ের বদলে মাস্টারমশাইয়ের সামনে এগিয়ে দিল 'সেই বইটা'।

বইটা হাতে পাওয়া মাত্র ঝট্ করে মাস্টারমশাইয়ের ঘুম কেটে গেল। চটি একখানা বই। মলাটের ওপর ছোরা হাতে, মুখোশ পরা একটা বিদঘুটে লোকের ছবি। বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা—'জীবন্ত মৃত্যু'।

ধাঁ করে বাঁ হাত বাড়িয়ে, পিণ্টুর কান পাকড়ে কাছে টেনে এনে, ডান হাতে গোটা চারেক জ্বালাময়ী গাঁট্টা লাগিয়ে, মাস্টারমশাই চোখ রাঙিয়ে বললেন, "বটে, এই বুঝি অঙ্ক হচ্ছে? গতবারের রেজাল্ট কি ভুলে গেছ? কাল রোববারে একটা বাংলা রচনা, পঁচিশটা অঙ্ক আর একপাতা ইংরিজী ট্রানস্লেশন যদি না-করে রাখ তো সোমবার তোমার কপালে দুঃখু আছে বলে রাখছি।"

এই বলে তখনকার মতো অঙ্কগুলো শেষ করার আদেশ

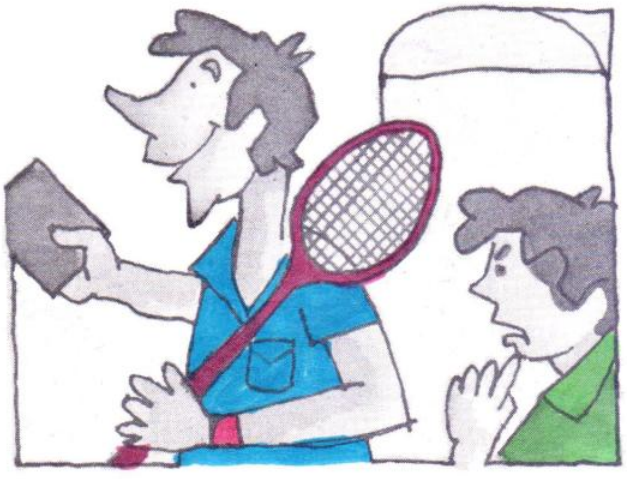

দিয়ে তিনি বইটা খুলে উল্টোতে লাগলেন।

"ইস্, এই রকম যাচ্ছেতাই বই আজকালকার ছেলেরা কেন যে পড়ে!" বলতে বলতে, মাস্টারমশাই বইয়ের প্রথম পাতাটা পড়তে শুরু করলেন। ক্রমশ তিনি খাড়া হয়ে বসলেন, তারপর ঝুঁকে পড়ে পড়তে লাগলেন। পিণ্টু বার-দুই অঙ্ক জিজ্ঞেস করে কড়া ধমক খেয়ে চুপ মেরে গেল। ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে বই শেষ করে তবে তিনি উঠলেন। যাবার সময় পিণ্টুর মায়ের হাতে বইখানা দিয়ে বললেন, "স্টুডেণ্ট লাইফে এই সব আজেবাজে ডিটেকটিভ বই পড়া মোটেই উচিত নয়।" অতঃপর পিণ্টুকে তার হোম-টাস্কের কথা আরেক দফা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

পিণ্টুর মা তো বিরাট হই-চই জুড়ে দিলেন বই নিয়ে। "কোথা থেকে আনা হয়েছে এ বই? বল্ শিগগির।"

পিণ্টু জবাব দেয়, "খুকু এনেছে।"

"অ্যাঁ, খুকু! এই সব বই আনছে! কোথায় খুকু?"

খুকু কাছেই ছিল। মাত্র কয়েক পাতা পড়ার পর ছোড়দা জোর করে বইটা কেড়ে নেওয়ায় বেচারা খুবই চটে ছিল। কিন্তু নালিশের উপায় ছিল না। তাই আপাতত পিণ্টুর বেকায়দা অবস্থা দরজার আড়াল থেকে দেখে বেজায় মজা পাচ্ছিল। মায়ের ডাকে ভয়ে-ভয়ে বেরিয়ে এসে জানাল, "ওপরের গুদোমঘরে পেয়েছি। আমি কিন্তু পড়িনি। ছোড়দা নিয়ে নিল।"

মা বললেন, "হুঁ, নিশ্চয় বাবলু এনেছিল।"

বাবলু পিণ্টুর মাসতুতো দাদা। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে এ-বাড়িতে এসে মাস খানেক ছিল। সে যত রাজ্যের গল্পের বই এনে গিলত। পিণ্টু এবং খুকুরও সেই সব বই পড়ার ঝোঁক চাপায় দুই ভাইবোন খুব বকুনি খায়। বাবলু তারপর থেকে বই লুকিয়ে রাখত। গুদামঘরে আছে গাদা-গাদা পুরনো পত্রিকা, খালি টিনের কৌটো, শিশি বোতল ইত্যাদি জিনিস। খুকু তার পুতুলের কাপড় রাখার জন্যে একটা পছন্দসই বাক্সের সন্ধানে ওই ঘরে ঢুকে বইখানা আবিষ্কার করে।

"রোস, উনি আজ আপিস থেকে আসুন। তোমাদের একচোট হবে। লুকিয়ে-লুকিয়ে ডিটেকটিব পড়া হচ্ছে!" মা তর্জন করতে থাকেন।

পিণ্টুর বড়দা কলেজ থেকে ফিরে, খেয়ে দেয়ে ক্লাবে ব্যাডমিণ্টন খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। বইয়ের ব্যাপার কানে যেতে এসে বলল, "দেখি কী বই? ইস্, এই সব রাবিশ পড়ার জন্যেই তোদের জেনারেল-নলেজ এত পুওর।" এই বলে সে বইটা মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে পড়ল।

পিণ্টু মনে মনে গজরায়। ওঃ, উনি আবার জেনারেল নলেজ শেখাচ্ছেন। ইদিকে তো নিজে সেদিন, কোন এক দেশের রাজধানীর নাম বলতে না-পেরে, বাবার কাছে জেনারেল নলেজ নেই বলে বকুনি খেলে। আমি সব শুনেছি। দাঁড়াও না, তোমার ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেটের তার কাল সকালে দেখবে ইঁদুরে কেটে দিয়েছে!

পিণ্টুর বড়দার সেদিন আর ক্লাবে খেলতে যাওয়া হল না। আগাপাশতলা চুটিয়ে পড়ে খাবার আগে মায়ের হাতে বইখানা সমর্পণ করল। সেই সঙ্গে বইটার এক প্রস্থ শ্রাদ্ধ করতেও কসুর করল না।

পরের দিন রবিবার সকালটা পিণ্টুর যে কী-রকম বিশ্রী কাটল তা পিণ্টুই জানে, আর জানে তার প্রিয় বন্ধু ভজা। "ছাত্রজীবনের কর্তব্য" রচনাটা লিখতে গিয়ে পিণ্টু ইচ্ছে করেই ওই গুরুজনের প্রতি ভক্তি-টক্তির কথাগুলো স্রেফ বাদ দিয়ে দিল। উঃ, আর মাত্র দশ-বারো পাতা বাকী ছিল। ডিটেকটিভ পঞ্চু তরফদারের সঙ্গে দস্যু "সবুজ শার্দূল"-এর শেষ সংগ্রাম ঘনিয়ে এসেছে। কী হবে কে জানে! পঞ্চু তরফদার কি পারবে জিততে? ক্ষোভে পিণ্টুর নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। দেওয়াল-আলমারির ভিতরে রাখা বইটাকে সে বারবার অসহায় চোখে দেখে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মা পান চিবুতে-চিবুতে বইটা বের করলেন। একটার পর আর-একটা বালিশ চাপিয়ে জুত করে শুয়ে খুকুকে এক ধমক দিলেন, "খবরদার বেরুবি না। দুপুরে ঘুমুতে হবে বলে রাখছি। দিনভোর টই-টই করে মেয়ের কী ছিরিই না হচ্ছে।" তারপর তিনি বইখানা খুললেন।

খুকু বইটার দিকে একবার করুণ চোখে চেয়ে মটকা মেরে পড়ে রইল। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে বই শেষ করে, "ধ্যুৎ, যত্ত সব আজগুবি কাণ্ড" বলে, মা বইটা খুকুর উল্টো দিকে রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

খুকু সাবধানে উঠে বসল। হ্যাঁ, মা ঘুমিয়েছে। সে আ—স্তে হাত বাড়িয়ে বইখানা নিল এবং একটুও শব্দ না-করে পাতা উল্টিয়ে পড়তে লাগল।

প্রায় অর্ধেকটা পড়েছে, এমন সময় মা হঠাৎ পাশ ফিরলেন। ভয় পেয়ে খুকু টপ্ করে বই ঠিক জায়গায় রেখে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। মা বারকতক এ-পাশ ও-পাশ করলেন। আড়মোড়া ভাঙলেন। তারপর খুকুকে ঠেলা দিয়ে বললেন, "এই, ওঠ। আর ঘুময় না। দেখ তো পাঁচুর মা উনুনে আঁচ দিয়েছে কি না।"

খুকু দেখে এসে বলল, "হ্যাঁ, দিয়েছে।"

বইটা আলমারিতে তুলে রেখে মা চা বানাতে গেলেন।

রাত্তিরে সবাই খেতে বসেছে। সবাই চুপচাপ। হুস্‌হাস্ কচমচ শব্দ হচ্ছে। পিণ্টুর মন তো আজ সারা দিনই খিঁচড়ে আছে। আর খুকু? সে যে কোন্‌টার পর কী খাচ্ছে তা ঠাওরই করতে পারছে না। সারা বিকেল তার মন 'মৃত্যু গুহা'র মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সেই যেখানে পঞ্চু তরফদার নির্জন পাহাড়ে গুহার মধ্যে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। বাইরে একটা যমদূতের মতো দস্যু পাহারা দিচ্ছে। সবুজ শার্দূল গেছে বিখ্যাত রক্ত-হীরা চুরি করতে। যাবার সময় সে হুঙ্কার দিয়ে শাসিয়ে গেছে, ফিরে এসে তার বিচার করবে। সবুজ শার্দূলের পিছনে লাগার ফল টিকটিকি পঞ্চু তরফদারকে এবার হাতে-নাতে ভোগ করতে হবে। নিষ্ঠুর দস্যু-সর্দার সবুজ শার্দূলের বিচার মানে তো ভয়ঙ্কর মৃত্যু-দণ্ড। আর থাকতে না পেরে খুকু পিণ্টুর কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, "আচ্ছা ছোড়দা, পঞ্চু তরফদার কি মৃত্যু-গুহা থেকে রক্ষা পাবে?"

কথাটায় পিণ্টুর কাটা ঘায়ে যেন নুন পড়ল। খুকুকে এক কনুইয়ের গুঁতো মেরে বলে উঠল একটু জোরেই, "জানি না।"

বাবা চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন। মায়ের কানেও কথাগুলো গিয়েছিল। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "ফের সেই বই নিয়ে আরম্ভ করেছ। দেখ, কোত্থেকে এক রদ্দি ডিটেকটিভ বই জুটিয়েছে, তাই নিয়ে দুই ভাই-বোনের আর নাওয়া-খাওয়া নেই। আহা, কী আমার বই রে। কেবল পাতায়-পাতায় খুন আর ঘুষোঘুষি। আর নামের কী ঘটা—জীবন্ত মৃত্যু।"

বাবা কড়া গলায় বললেন, "পিন্টু, তোমার আগের বারের অঙ্কের রেজাল্ট মনে আছে তো? বেশ, বই পড়তে হলে ভাল বই পড়। জীবনী, জাতকের গল্প, ভ্রমণকাহিনী। না, কেবল বাজে বই পড়ে সময় নষ্ট! কোথায় রেখেছ বইটা?"

মা বললেন, "আলমারিতে তুলে রেখেছি। ওদের বারণ করে দিয়েছি, খবরদার, কেউ ছোঁবে না।"

"হুম্।" বাবা গম্ভীর মুখে খেতে লাগলেন।

রাত্তিরে অন্ধকার ঘরে শুয়ে খুকুর আর ঘুম আসছে না। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। বাড়ির সবাই তার শত্রু। মা এখনও শুতে আসেনি। একা-একা শুয়ে তার মন অভিমানে গুমরে-গুমরে উঠতে লাগল।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে খসখস আওয়াজ। একটা ছায়ামূর্তি মশারির পাশ দিয়ে আলমারির কাছে এগিয়ে গেল। কে? মা? কিন্তু মা তো অত লম্বা নয়। তক্ষুনি খুকুর মনে পড়ে গেল দস্যু 'সবুজ শার্দূল'-এর বর্ণনা। দীর্ঘদেহী, ছায়ামূর্তি, নিঃশব্দচরণ। নিশ্চয় এ কোনো দস্যু। একবার খুকু চেঁচিয়ে ডাকতে চেষ্টা করল বাবাকে। কিন্তু গলা কাঠ, আওয়াজ বেরুল না। এদিকে সে বুঝতে পারল, ছায়ামূর্তি আলমারি খুলল। কী সব খুটখাট শব্দ। নির্ঘাত ও মায়ের নতুন সোনার হারটা নিচ্ছে। মা বিকেলে ওই হার পরে পাশের বাড়িতে বিনি-মাসীর কাছে বেড়াতে গেছিল। ফিরে এসে আলমারিতে রেখেছে। লোকটা এবার দরজার দিকে ফিরে চলল। ও দরজার বাইরে গেলেই খুকু চেঁচাবে ঠিক করেছে। দরজার পরদার বাইরে বারান্দার আলো দেখা যাচ্ছে। ছায়ামূর্তি পর্দা সরিয়ে বারান্দায় পা দিল। এক ঝলক আলো পড়ল তার গায়ে।

এ কী! এ যে বাবা! আর তাঁর হাতে সেই বইটা!!

খুকুর আর চিৎকার করা হল না।

কলামন্দিরে 'তাসের দেশ'

কলকাতার মডার্ন হাইস্কুল ফর গার্লস গত ২১ আর ২২ সেপ্টেম্বর কলামন্দিরে রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটকটি করে। এই নাটকটিতে অভিনয় করেছিল, না, কোন বড়সড় নাম-করা অভিনেতারা নন—স্কুলের শিক্ষিকারাও নন, এই স্কুলের ছাত্রীরা। ক্লাস সিক্স থেকে নাইন পর্যন্ত ক্লাসের ছাত্রীরা মঞ্চে নেমেছিল। চমৎকার সাজগোজে তাদের দেখাচ্ছিল অবশ্য বেশ বড়। মনে হচ্ছিল সত্যিকার রাজপুত্র-সওদাগরপুত্র, বিলকুল তাসের দেশের ছক্কা-পাঞ্জা আর বিবিরা। সবশুদ্ধ বত্রিশজন অভিনয় করেছিল; অথচ, যেটা অবাক হবার কথা, সেই বত্রিশ-জনের কেউই মঞ্চের এদিক-ওদিক করেনি, ভুল করেনি চলা-ফেরায়, হাত-পা নাড়ায়। যাকে আমরা নাটকের ভাষায় 'কোরিওগ্রাফি' বলি সেটা সুশৃঙ্খলভাবে মঞ্চে অনুসরণ করা হয়েছিল। এই বত্রিশজনই ভারি ভালো অভিনয় করেছে এবং নেচেছে; সেখানে কোনো ছেলেমানুষিও ছিল না। আমাদের তার মধ্যেও সবচেয়ে ভাল লেগেছে সুপ্রিয়া সেন (রাজপুত্র) পৌলমি চ্যাটার্জি (সওদাগরপুত্র) সোনিয়া গুপ্ত, মৌসুমী চ্যাটার্জি, সুদেষ্ণা, চন্দ্রলেখা, পিয়া ভট্টাচার্যকে। এদের প্রত্যেকের কথাবার্তাও স্পষ্ট আর ঠিক যে চরিত্রে অভিনয় করেছে—কবির সেই চরিত্রের মতই।

পিছনে বসে গান করেছে অনেকে। তার মধ্যে বড়দের মত গলায় সুর ঠিক রেখে একক গান করেছে শর্মিলা বসু, অলকা যাজ্ঞিক আর সুপ্রীতা দাশ। সমস্ত অনুষ্ঠানটি রূপে-বর্ণে জম-জমাট হয়েছিল, তার চেয়েও বড় কথা রবীন্দ্রনাথের নাটক হয়েছিল। —বসুগুপ্ত

বড়দের কথা

ইন্দ্রমিত্র

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের একজন বন্ধু চীনা পেয়ালায় চা খেতে দিয়েছেন। একটি পাথরের বাটি আনিয়ে নিলেন ভূদেব ; চাটুকু ওই পাথরের বাটিতে ঢেলে নিয়ে খেলেন।

পেয়ালা থেকে চা পাথরের বাটিতে ঢেলে খেলেন কেন?

বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে ভূদেব পেয়ালা-পিরিচ হাতে নিলেন, পেয়ালা-পিরিচের পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধতা ও কারিগরির প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, "যদি আমাদের দেশের কুমোরেরা এ-জিনিস গড়তে পারত, তবে আমি আদর করে ব্যবহার করতাম।"

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তখন মৃত্যুশয্যায়। বিছানার চাদরখানা খুব মোলায়েম নয়। বড় ছেলে গোবিন্দদেব বললেন, "বাবা, এ-সময়ে একখানা মোলায়েম বিলাতি চাদর কিনে এনে বিছানায় পেতে দিলে ভালো হয় না কি?"

হাজার হাজার বিদেশী বইতে ভূদেবের আলমারি ভর্তি বটে, কিন্তু নিজের শরীরের আরামের জন্য কখনও তিনি বিদেশী জিনিস ব্যবহার করেননি।

ভূদেব মৃত্যুশয্যায় শুয়ে গোবিন্দদেবকে বললেন, "আর বড় বেশি দেরি নেই। এই শেষমুহূর্তে বিদেশী কাপড় ব্যবহার করে মনের অশান্তি বাড়াব না।"

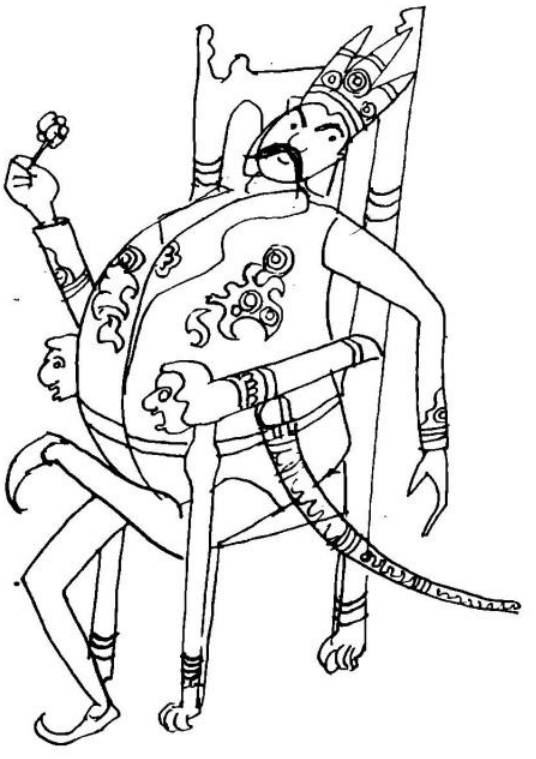

রাজা রে রাজা

পবিত্র সরকার

রাজা রে রাজা,
বাজনা বাজা!
তোর তো শুনি
দারুণ মজা—
পরিস ভালো
জুতো-মোজা,
রোজ খেতে পাস
খাজা-গজা,
দুধ-ভেজানো মুড়ি!
তাই কি হল নাদুসনুদুস ভুঁড়ি?

রাজা রে রাজা,
দিস নে সাজা!
রাখিস খুলে
সিং-দরোজা—
যাবে রে তোর
ভক্ত প্রজা
ঐ ভুঁড়িতে আলতো দিতে
সুড়সুড়ি, সুড়সুড়ি ॥

ডাইনোসর-চুরি

. লন্ডনের বাইরে সেই তিন মহিলা...
আমি লন্ডনে ফিরে যাচ্ছি। মাস্টার এডওয়ার্ডের এতক্ষণে নিশ্চয়ই সব কিছু মনে পড়েছে!
হেটি, ওই চীনেদের আস্তানাটা তোমার বাড়ি নয়, যে খালি ঢুকবে আর বেরোবে।

আমি আগেও ঢুকেছি, এবারও ঢুকব!

!?

জাদুঘরে.....

হঠাৎ দু'জন চীনার মধ্যে হাতাহাতি বেধে গেল ...
এ কী!

এই সুযোগে!
ডাইনোসরের ঘর আজ বন্ধ!

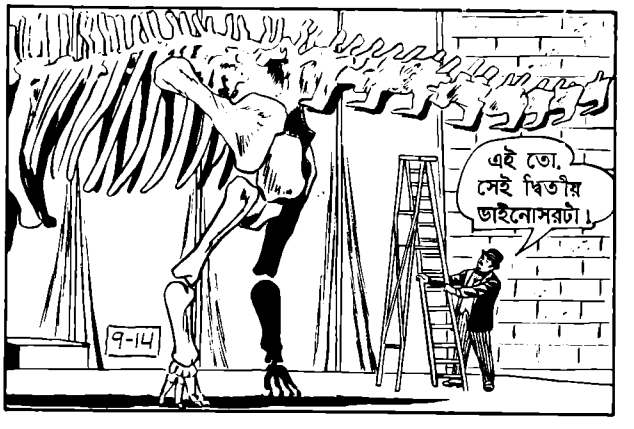
এই তো, সেই দ্বিতীয় ডাইনোসরটা!
9-14

এই গর্দান

আঃ!

এই তো সেই 'লোটাস এক্স'!

চীনা রেস্তোরাঁর নীচে একটা এঁদো কুঠুরি.....
মহামান্য নুপ্ ওয়ান্ তোমাকে ডাকছেন।
আমার কথা ভোলেননি দেখছি।

কী জানতে চায়?
গিয়েই দ্যাখো!

নুপ ওয়ান্ বেশ খোশ্‌মেজাজে অভ্যর্থনা জানাল তাকে...
কী, 'লোটাস এক্সে'র ফরমুলাটা আমার সঙ্গে দেখবে নাকি?
নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, তোমরা গুপ্তচররা ত দেখতে চাইবেই।
আমি গুপ্তচর নই, আমি একজন ব্যবসাদার।

ঠিক তক্ষুনি.....
মাস্টার এডওয়ার্ড!
ধাইমা!

লোটাস এক্সের রহস্য প্রায় ফাঁস করে এনেছি। আসুন, আপনিও দেখবেন।
তা, বেশ তো!
9-21

বন্ধুগণ, যা আমরা খুঁজছিলাম...

এই সেই ফরমুলা, 'লোটাস এক্স'...
এর পর আগামী সংখ্যায়

বাগবাজার মালটিপারপাস গার্লস স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা কী বলেন

"ইংরেজীতে ভাল হবার একটাই রাস্তা—তা হল মানে-বই পড়া বন্ধ করে টেক্সট বই বারবার পড়া। ছোট-ছোট সহজ সরল ইংরেজী শেখার চেষ্টা করা উচিত, তারপর আস্তে-আস্তে ভাষাটা চেনাজানা হয়ে যায়। প্রথম থেকেই জটিল খটোমটো ইংরেজী নিয়ে হিমসিম খাওয়া বা গ্রামারের কচকচি নিয়ে মাথা ঘামানো ঠিক নয়। ছোট ছোট সরল ইংরেজীতে লেখা ভাল-ভাল গল্প-কবিতা পড়ারও অভ্যেস গড়ে ওঠা দরকার।"

বাগবাজার মালটিপারপাস গার্লস' স্কুলের বয়েস সবে এগারো, এর মধ্যেই ১৯৭০-এর হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় হোম সায়েন্স বিভাগের প্রথম স্থানটি দখল করে নেয় এই স্কুলের মেয়ে রীতা সাহা, আর তার চার বছর পরে হিউম্যানিটিজ বিভাগে চতুর্থ হল ওই স্কুলেরই শ্রাবন্তী ঘোষ, আর এবারকার হিউম্যানিটিজে প্রথম-হওয়া মেয়ে জয়ন্তী রায়চৌধুরী ক্লাস সেভেন থেকেই ওই স্কুলের ছাত্রী। ন্যাশনাল স্কলারশিপ তো প্রতি বছরই এখানকার কোনও-না-কোনও মেয়ের জন্যে বাঁধা।

কীভাবে পড়লে লেখাপড়ায় এরকম ভাল হওয়া যায়? প্রথমে ইংরেজীর কথাই ধরা যাক। ইংরেজীতে অনেকেরই একটু ভয়-ভয় ভাব থাকে, অনেকেই ফেল করে কিংবা কম নম্বর পায়। ইংরেজীতে ভাল হবার উপায় কী?

আমার প্রশ্ন শুনে স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা অণিমা মুখোপাধ্যায় বললেন, "ইংরেজীতে ভাল হবার একটাই রাস্তা—তা হল মানে-বই পড়া বন্ধ করে টেক্সট বই বারবার পড়া। ছোট ছোট সহজ সরল ইংরেজী শেখার চেষ্টা করা উচিত, তারপর আস্তে-আস্তে ভাষাটা চেনাজানা হয়ে যায়। প্রথম থেকেই জটিল খটোমটো ইংরেজী নিয়ে হিমসিম খাওয়া বা গ্রামারের কচকচি নিয়ে মাথা ঘামানো ঠিক নয়। ছোট ছোট সরল ইংরেজীতে লেখা ভাল-ভাল গল্প-কবিতা পড়ারও অভ্যেস গড়ে ওঠা দরকার। আমাদের স্কুলে লাইব্রেরির লম্বা টেবিলে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে নানারকম ইংরেজী বইও সাজিয়ে রাখা হয়, অফ পীরিয়ডে মেয়েরা ওসব বই ঘাঁটে, এটা-ওটায় চোখ বুলোয়। আমি নিজেও ওদের কখনও-কখনও ইংরেজী বই বা পত্রিকা থেকে পড়ে শোনাই, আমি দেখেছি ওরা বেশ আগ্রহ নিয়ে শোনে।"

"গ্রামারও তো না-জানলে নয়, কীভাবে সহজে শেখা যায়?"

"প্রিপোজিশন, ইডিয়োমেটিক ফ্রেজেস মুখস্থ করা দরকার, কিন্তু গ্রামারের বেশির ভাগ নিয়মকানুন প্রথমে বোঝা ও পরে বারবার প্র্যাকটিস করা উচিত।"

আমি বললাম, "বাংলাতে বাঙালীর ছেলেমেয়েরা দুর্বল, এর কী প্রতিকার আপনারা ভেবেছেন?"

"নোটবই ভুলতে হবে, ভাল-ভাল বই পড়ার অভ্যেস করতে হবে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরের লেখকদের রচনার সঙ্গেও ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় থাকা দরকার। আমি এটার ওপর খুব জোর দিই। আমাদের স্কুলে একেবারে হালের লেখকদের গল্প-উপন্যাস-কবিতার বই নিয়মিত আনাই, মেয়েরা সেসবের অনুরাগী পাঠিকা।"

ইতিহাসের কথা উঠতে প্রধান-শিক্ষিকা বললেন, "মুখস্থ নয়, একটু খেয়াল রেখে বারবার পড়লে ইতিহাস আর শক্ত ব্যাপার থাকে না। গল্প পড়ার মতো করে পড়া দরকার।"

আর ভূগোল? শুনে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় বললেন, "ভূগোলকে অনেকেই ভয় পায়, কিন্তু বই পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাপ দেখলে,

ম্যাপের মধ্যে ঘুরে বেড়ালে ভূগোল পড়তেও ভাল লাগবে। আমাদের স্কুলে প্রতি বছর শিক্ষামূলক প্রদর্শনীতে মেয়েরা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ভূগোলের অনেক বিষয় নিয়েও চার্ট তৈরি করে। চার্ট তৈরি করে পড়লে ভূগোলে সবাই ভাল হতে পারে।"

ছাত্রীদের সঙ্গে প্রধান-শিক্ষিকার সম্পর্ক প্রায় বন্ধুর মতন। ছাত্রীদের নিয়ে মেতে থাকেন। নানা অনুষ্ঠানে মেয়েদের নিয়ে সদাই উপস্থিত। হেসে বললেন, "ওদেরই জিজ্ঞেস করুন-না, ওরা কীভাবে পড়াশোনা করে।"

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল একটুও না-ভেবে বলে দিল, "আমাদের স্কুলে মেয়েরা ক্লাস সেভেন থেকেই লাইব্রেরি ব্যবহার করে। পাঠ্যবই ছাড়াও প্রত্যেক বিষয়ের ওপর অন্যান্য ভাল বই থেকে ভাল-ভাল অংশ বেছে, যে যার নিজের নোট তৈরি করে নেয়। লেখাটাও যাতে ভাল হয়, সেদিকে আমাদের ক্লাসের দিদিরা নজর রাখেন ও দরকার মতো পরামর্শ দেন।"

"শুনলেন তো।" প্রধান-শিক্ষিকা হেসে বললেন, "এইভাবে রোজকার পড়া রোজ তৈরি করা ও নিজের মতো করে রোজ লেখা —এইটাই লেখাপড়ায় ভাল হবার মূল কথা।"

আমি বললাম, "কিন্তু লেখাপড়ায় যারা একটু পিছিয়ে-পড়া, তাদের পক্ষে ম্যাপ ঠিক-ঠিক মতো চিনতে পারা, কি চার্ট বানানো, কিংবা বাইরের ভাল-ভাল বই থেকে ভাল অংশ বেছে নোট তৈরি করা কি সম্ভব? তাদের কিসে উপকার হতে পারে?"

"আমরা কিন্তু ভর্তির সময় শুধু ভাল ছাত্রী বেছে-বেছে ভর্তি করি না। জেনে রাখুন, অন্য স্কুলের ফেল-করা মেয়েও আমরা নিয়েছি। বুঝতেই পারছেন, পিছিয়ে-পড়া ছাত্রীদের সমস্যা নিয়ে আমাদের ভাবতেই হয়। আপনি যাদের কথা বলছেন, তাদের কী করা উচিত শুনুন। প্রথমেই বাইরের বই নিয়ে বইয়ের সংখ্যা ভারি করার দরকার নেই। ক্লাসের পাঠ্য বই রোজ খানিকটা করে পড়ে, সেই অংশটা বারবার পড়ে, সেটাকে একটু নিজের মতো করে লিখে নেওয়া নিশ্চয়ই খুব কঠিন নয়। এভাবে পাঠ্য বই পড়া হয়ে গেলে তারপর ওই সাবজেক্টে আরও একটা ভাল বই পড়া উচিত। এই নতুন বইয়ের যেসব অংশ আগের বইটায় ছিল না বা ভাল করে বোঝানো ছিল না, সেইসব অংশ ঠিকমতো বুঝে বুঝে লিখে নিলে কোনও পিছিয়ে-পড়া ছাত্র-ছাত্রীই আর পিছনে পড়ে থাকবে না। ভাল বই যত বেশী পড়বে ও তা থেকে যত বেশী লেখার অভ্যেস করবে, লেখাপড়ায়ও ছেলেমেয়েরা ততই ভাল হয়ে উঠবে। পড়া, বারবার পড়া, ঠিক ঠিক বুঝে নেওয়া ও নিজের মতো করে লেখা—লেখাপড়া মানেই তো তাই।"

কীভাবে তৈরী হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

বাগবাজার মাল্টিপারপাস গার্লস স্কুলের ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল পূরবী মুখোপাধ্যায় পাঠ্য বই ছাড়া শুধু ভূগোলের ওপরেই কী-কী বই পড়ছে শোনো। নীলোৎপল শ্যাম, লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সাহা-সেন, সুভাষরঞ্জন বসু, শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মিত্র—এরকম আরও কয়েকজন লেখকের বই। তাছাড়া "প্র্যাকটিক্যাল নলেজ ফর অল" বইয়ের ভূগোলের অধ্যায়। "মডার্ন জাপান" থেকে পড়ছে জাপান বিষয়ে। পূরবী বলল, "ভূগোলে আমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছেন আমার বাবা। ফাইভ-সিক্সে ভূগোল বিরক্তিকর লাগত। তারপর বাবা একদিন আমাকে ভূগোল বুঝিয়ে দিলেন। এখন আমি খবরের কাগজ থেকেও নোট নিই। কোথায় কী খনিজ আবিষ্কার হল, বিদ্যুৎ উৎপাদনের নতুন কোন্ প্রণালী উদ্ভাবিত হল—এসব খবরের কাগজ ছাড়া আর কী করে জানব? বই ছাপা হবার সময় পর্যন্ত যেসব জ্ঞান প্রচলিত থাকে, বইয়ে তো শুধু সেগুলোই থাকে। বইয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চারটে প্রণালীর কথা পড়েছিলাম, আরও দুটো প্রণালীর কথা সম্প্রতি খবরের কাগজ থেকে জেনেছি।"

"সামনের বার মাধ্যমিক পরীক্ষায় তুমি নিশ্চয় খুব ভাল রেজাল্ট করবে বলে আশা কর?"

"আশা করি, কী হবে জানি না।"

"তুমি লাইফ সায়েন্সে কীভাবে তৈরী হচ্ছ?"

পূরবী কথা বলে চটপট, চোখে-মুখে বুদ্ধি চিকচিক করছে আমি দেখতে পাই, একটুও গম্ভীর না হয়ে উত্তর দিল, "গ্রে-র অ্যানাটমি আর মেডিকেল ক্লাসের ফিজিওলজি বই থেকে পড়া তৈরী করছি। আমার দিদি এ বিষয়ে আমাকে খুব সাহায্য করেছে। দিদি ডাক্তারি পড়ে, ওর ক্লাস-নোট থেকেও আমি আমার পড়া বুঝে নিই। এই বিষয়ে বাংলায় লেখা আট-দশটা বই আছে। আমি মোটামুটি সবগুলোই পড়ছি।

"সংস্কৃত?"

"একেকটা পিস পড়া হয়ে গেলে ওর মধ্যে ব্যাকরণের যা-কিছু নিয়মকানুন সেগুলো বুঝে নিই ও শিখে রাখি।"

বাংলা ও ইংরেজী টেক্সট্ মন দিয়ে পড়া উচিত, পূরবীও তা-ই পড়ছে।

আমি বললাম, "ইতিহাসের ভাল বই কী পড়া উচিত? তুমি কী-কী পড়ছ?"

"আধুনিক ভারতের ইতিহাসের জন্যে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' আর প্রাচীন যুগের জন্যে কিরণ চৌধুরীর বি. এ. ক্লাসের বই থেকে নোট নিয়েছি। আরও কয়েকটা বইও লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়েছি। ক্লাসে অতুল রায়ের বই পড়ানো হয়, সেটাও আমার বেশ ভাল লাগে, বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশটা।"

ক্লাস সেভেন থেকে ওই স্কুলের ফার্স্ট গার্ল পূরবীর ভাল লাগে গাইডিং, আসন ও খেলাধুলো। সামনের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যে এ বছরটা খেলাধুলো বন্ধ। কবিতা পড়তে খুব ভাল লাগে। বলল, "এখনকার সব কবিদের কবিতাই আমি পড়ি।"

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

উপন্যাস

মনোজদের অদ্ভুত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে

মনোজদের বাড়িতে একটি অচেনা ছেলের ছবি আছে। ছবির ছেলেটাকে মনোজের খুব ভাল লাগে। ওদের বাড়িটা সত্যিই অদ্ভুত। একদিন একটা কাক ঠাকুমাকে ভীষণ জ্বালাতন করছিল। দেখে শুনে পুরুতমশাই বললেন, এ তো কাক নয়, নিশ্চয়ই আত্মা-টাত্মা। ওদিকে ঠিক তখনই গানের মাস্টারমশাই গণেশবাবু গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দুঃখহরণবাবু হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ায় আর পারলেন না। গণেশবাবু দড়িটা এনেছিলেন গরুর গলা থেকে খুলে। সেই ছাড়া-গরুটা আদ্যাশক্তি দেবীকে চুঁসিয়ে ফেলে দিল গোবরের গর্তে। তাই নিয়ে প্রচণ্ড হৈ-চৈ। এদিকে ওই কাকের মুখে সংস্কৃত শুনে পুরুতমশাই হঠাৎ ভয় পেয়ে দৌড়ে ঢুকলেন হারাধনের ল্যাবরেটরিতে। মনোজের মেজোকাকা ভজহরিবাবু বাজার করতে ওস্তাদ। বাজারে গিয়ে তিনি মাছ কিনছেন, এমন সময় গোয়েন্দা বরদাচরণ তাঁকে বলেন, বাড়িতে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। তিনি এসে দেখেন, একটা কাক তাঁর দাদার পৈতে চুরি করে পেঁপেগাছে বসে আছে। রাখোবাবু যখন মনোজের গুলতি নিয়ে কাকটাকে তাক করছেন, তখন পাঁচিলের ওপর দেখা গেল বরদাচরণকে। একটু পরেই বরদাচরণ কাকের ঠোক্কর খেয়ে উল্টে পড়লেন উঠোনে। তাঁর ছিটকে-পড়া পিস্তল লুকিয়ে পাচার হয়ে গেল পুতুলের পুতুল-খেলার বাক্সে। হরিণগড়ের রাজা গোবিন্দনারায়ণের নিখোঁজ ছেলে কন্দর্পনারায়ণের ছবির সন্ধানে এসে হতাশ হলেন বরদাচরণ। পুতুলের অ্যালবামে রাখা অচেনা ছেলেটার সেই ছবিটা কোথায় গেল! রাজামশাই বলেছেন, যার কাছে রাজকুমারের ছবি পাওয়া যাবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তাই না শুনে রাখোবাবু বাড়ির সবাইকে ডেকে বললেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছবিটা খুঁজে বার করতেই হবে। তারপর—

৬

ইস্কুলে ইণ্টারক্লাস ক্রিকেট লীগ চলছে। সেই নিয়ে এবার চারদিকে খুব উত্তেজনা। এমনিতে এক ক্লাসের সঙ্গে অন্য ক্লাসের খেলায় আর উত্তেজনার কী থাকবে?

আসলে হয়েছে কি, এবার ক্লাস নাইনে দুটি নতুন ছেলে এসে ভর্তি হয়েছে। তারা যমজ ভাই, হুবহু একরকম দেখতে। তারা পোশাক করে একইরকম, টেরি কাটে মাথার একই ধারে, এমন কি দুজনেরই বাঁ গালে তিল। তফাত শুধু নামে, একজনের নাম সমীর, অন্যজনের নাম তিমির। দুই ভাই-ই দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলোয়াড়। তবে খেলাতে দুই ভাইয়ের কিছু তফাত আছে। সমীর সাঙ্ঘাতিক জোরে বল করে, তার বল চোখে ভাল করে ঠাহর হয় না। অন্যজন তিমির বেদম ব্যাট করে, প্রায় ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেও নট আউট থেকে যায়।

দুই যমজ ভাইয়ের দৌলতে ক্লাস নাইন এবার দুরন্ত টিম। স্কুলের চ্যাম্পিয়ন তো তারা হবেই জানা কথা। শোনা যাচ্ছে এবার সমীর আর তিমিরকে জেলা একাদশেও নেওয়া হবে। যেদিন ক্লাস নাইনের খেলা থাকে সেদিন মাঠের চারধারে বহু লোক জমে যায় সমীর-তিমিরের বলের হলকা আর ব্যাটের ভেলকি দেখতে।

নাম-ডাক হওয়াতে দুই ভাইয়েরই কিছু ডাঁট হয়েছে। এমনিতেই তারা বড়লোকের ছেলে। তাদের বাবা সিভিল সার্জেন। দুটো সবুজ রঙের রেসিং সাইকেলে চেপে তারা ইস্কুলে আসে। টকাটক ইংরিজিতে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। কাউকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না। ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা পর্যন্ত তাদের একটু সমঝে চলেন।

ওদিকে ক্লাস এইটও বেশ ভাল টিম। যদিও তাদের সমীর বা তিমিরের মতো বোলার বা ব্যাটসম্যান নেই তবু গেম টিচার তারক গুহ বলেন, "আমার মনে হয়, ক্লাস এইট একটা আপসেট করতে পারে।"

এইট-এর ক্যাপটেন মনোজ। বলতে কি, ক্লাস সেভেন-এ পড়ার সময়ে সে প্রথম ক্রিকেটের হাতে-খড়ি করে। ব্যাট খারাপ করে না, বলও খুব জোরে করতে পারে। এইট-এ উঠে ইণ্টারক্লাস লীগে এ পর্যন্ত সব কটা ম্যাচ তারা জিতেছে। প্রত্যেকটাতেই মনোজের রান ভাল, উইকেটও খারাপ নেয়নি।

তারক গুহ প্রবীণ লোক। একসময়ে নাকি কলকাতায় ভাল টিমে ক্রিকেট খেলতেন। কোচ হিসেবে তাঁর তুলনা নেই, সবাই বলে। মফস্বলের স্কুলে সামান্য বেতনের গেম টিচারের চাকরি করেন বলে তেমন পাত্তা দেয় না কেউ। রোগা, কোল-কুঁজো, বুড়ো শকুনের মতো চেহারা তারকবাবুর। গায়ের রঙ ব্ল্যাকবোর্ডের মতো কালো। পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো সব খয়েরী হয়ে গেছে। গায়ে সবসময়ে বেঢপ বড় সাইজের সাদা ফুলহাতা জামা, পরনে সাদা জিনের প্যাণ্ট, কোমরে কখনো দড়ি কখনো মোটা চামড়ার বেল্ট বাঁধা, পায়ে কেডস। এছাড়া তারকবাবুকে অন্য পোশাকে দেখা যায় না। জামা কাপড় সবসময়ে ময়লা। নাকে নস্যি দেন বলে খোনা সর্দির গলায় কথা বলেন। তাঁর ল্যাকপ্যাকে হাত পা, চেহারা আর পোশাক দেখে কিছুতেই ভাবা যায় না যে এ লোক খেলার কিছু জানে।

তারকবাবুকে সমীর-তিমিরও পাত্তা দেয় না। বরং তারকবাবুই সেধে যেচে ওদের কাছে গিয়ে নেট প্র্যাকটিসের সময় নানারকম উপদেশ দেন। ওরা হাসে। সমীর একদিন মুখের ওপরেই বলে দিল, "আপনি তো স্যার কখনো ফাস্ট বল চোখেই দেখেননি ভাল করে, ইনসুইং-এর গ্রিপ আপনার কাছে কী শিখব! আমি কলকাতায় ফাদকারের কাছে বোলিং শিখেছি।"

সেই থেকে তারকবাবুর ওদের ওপর খুব রাগ। ভাল খেল সে তো ঠিক আছে, তা বলে প্রশিক্ষককে সম্মান দেবে না?

সেই থেকে তারকবাবু হন্যে হয়ে অন্য ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে সত্যিকারের ক্রিকেট-প্রতিভা খুঁজে বেড়িয়েছেন।

এইভাবেই একদিন মনোজকে তাঁর নজরে পড়ে। এইট-এর সঙ্গে টেন-এর খেলা ছিল। মনোজ বারো রানের মাথায় একটা হুক মারতে গিয়ে ক্যাচ তোলে। আউট হয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে তারকবাবু ধরলেন। বললেন, "ছোকরা, তোমার বয়সী কোনো ছেলে যে লেট কাট মারতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। কোত্থেকে শিখলে?"

মনোজ আমতা-আমতা করে বলল, "ক্রিকেটের বইয়ের ছবি দেখে স্যার।"

"বাঃ! বাঃ!"

ভারী খুশি হলেন তারকবাবু, তাঁর কোটরগত চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল। বললেন, "সত্যিকারের প্লেয়ার

হতে চাও? তবে আমি তোমাকে প্লেয়ার বানাব, কিন্তু একটু কষ্ট করতে হবে বাবা।"

মনোজ রাজী হয়ে গেল।

সেই থেকে তারকবাবু গোপনে মনোজকে তালিম দেন। মাঝে মাঝে বলেন, "তোমার বডি তো খুব ফিট। দমও অনেক। ফাস্ট বোলিং তোমার হবেই।"

সারা স্কুলে মোট পাঁচটা টিম। ফাইভ, সিক্স, সেভেন মিলিয়ে একটা টিম, আর চারটে উঁচু ক্লাসের।

ক্লাস নাইন ক্লাস এইট ছাড়া বাকি সবাইকে হারিয়ে দিল। ক্লাস এইটও নাইন ছাড়া বাকি সবাইকে হারাল; দু ক্লাসের পয়েন্ট সমান। এই দুই ক্লাসের খেলায় যে জিতবে সে-ই চ্যাম্পিয়ন।

সবাই জানে নাইন জিতবে। ইলেভেন-এর বড় ছেলেদের সঙ্গে খেলাতেও নাইন নয় উইকেটে জিতেছিল। সমীর নটা উইকেট পায় মাত্র নয় রানে। তিমির নিরানব্বই করেছিল একা। কাজেই বোঝা যাচ্ছে ক্লাস নাইন কী সাঙ্ঘাতিক টিম।

আজ ফাইনাল খেলা। ফার্স্ট পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি হয়ে গেল। খেলার মাঠের চারিদিকে দারুণ ভিড় আর ধাক্কাধাক্কি। মাঠের মাঝখানে তিনটে করে ছটা স্টাম্প গাড়া হয়ে গেছে। স্বয়ং সিভিল সার্জেন, ডি এস পি আর মুনসেফ খেলা দেখতে এসেছেন। তাঁদের জন্য আলাদা চেয়ারের ওপর ছোট ত্রিপল টাঙানো হয়েছে। ক্রেট বোঝাই লেমোনেড এসেছে মাঠে। চানাচুর, ঝালমুড়ি, ফুচকা আর আইস-ক্রিমের গাড়ি জড়ো হয়েছে। বেশ মেলা-মেলা ভাব।

তারকবাবু প্রচণ্ড উত্তেজনায় ছোটাছুটি করছেন।

এইট-এর ক্যাপটেন মনোজ আর নাইন-এর ক্যাপটেন সমীর মাঠে নেমে টস করল।

টসে জিতে গেল মনোজ। বিনা দ্বিধায় বলল, "ব্যাট।"

সমীর একটু কাঁধ ঝাঁকাল মাত্র।

ওয়ান ডাউনে মনোজ নামবে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান দুজন মাঠে রওনা হয়ে যেতেই তারক স্যার এসে বললেন, "মনোজ প্যাড-আপ করো। এক্ষুনি উইকেট পড়বে।"

মনোজ প্যাড বাঁধতে বাঁধতে বলল, "একঘণ্টা টিঁকতে পারলে হয়।"

তারক স্যার নিজে প্রচণ্ড উত্তেজিত। তবু বললেন, "উত্তেজিত হয়ো না মনোজ। আমি জানি সমীরের সুইং নেই। কিন্তু অসম্ভব জোরে বল আসে বলে আনাড়িরা খেলতে পারে না, লাগার ভয়ে আউট হয়ে চলে আসে। তুমি ঘাবড়াবে না।"

স্যারের কথাই ঠিক। মাঠে নামতে না নামতে ওপেনিং ব্যাট গদাইচরণ সমীরের দ্বিতীয় বলে বোলড হয়ে ফিরে এল।

মনোজ যখন নামছে তখন ক্লাস এইট-এর ছেলেরা খুব হাততালি দিল। সমীর দূর থেকে বলটা লোফালুফি করতে করতে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। তারকবাবু মনোজের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মাঠের মধ্যে খানিকদূর এলেন, বার বার বললেন, "সোজা বল, খেলতে অসুবিধা নেই। প্রথম থেকেই একটু মেরে খেললে দেখবে ও কাবু হয়ে গেছে।"

যদিও মনোজ খুব সাহসী ছেলে তবু এখন তার হাত-পা একটু ঝিম ঝিম করছিল! হাঁটুর জোরটা যেন কমে গেছে, হাতে ব্যাটটা বেশ ভারী-ভারী লাগছে।

গার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে ফিলডারদের অবস্থান দেখতে একটু সময় নিল মনোজ। ভয় করছে। বেশ কয়েকবার বুকটা দুরদুর করে ওঠে।

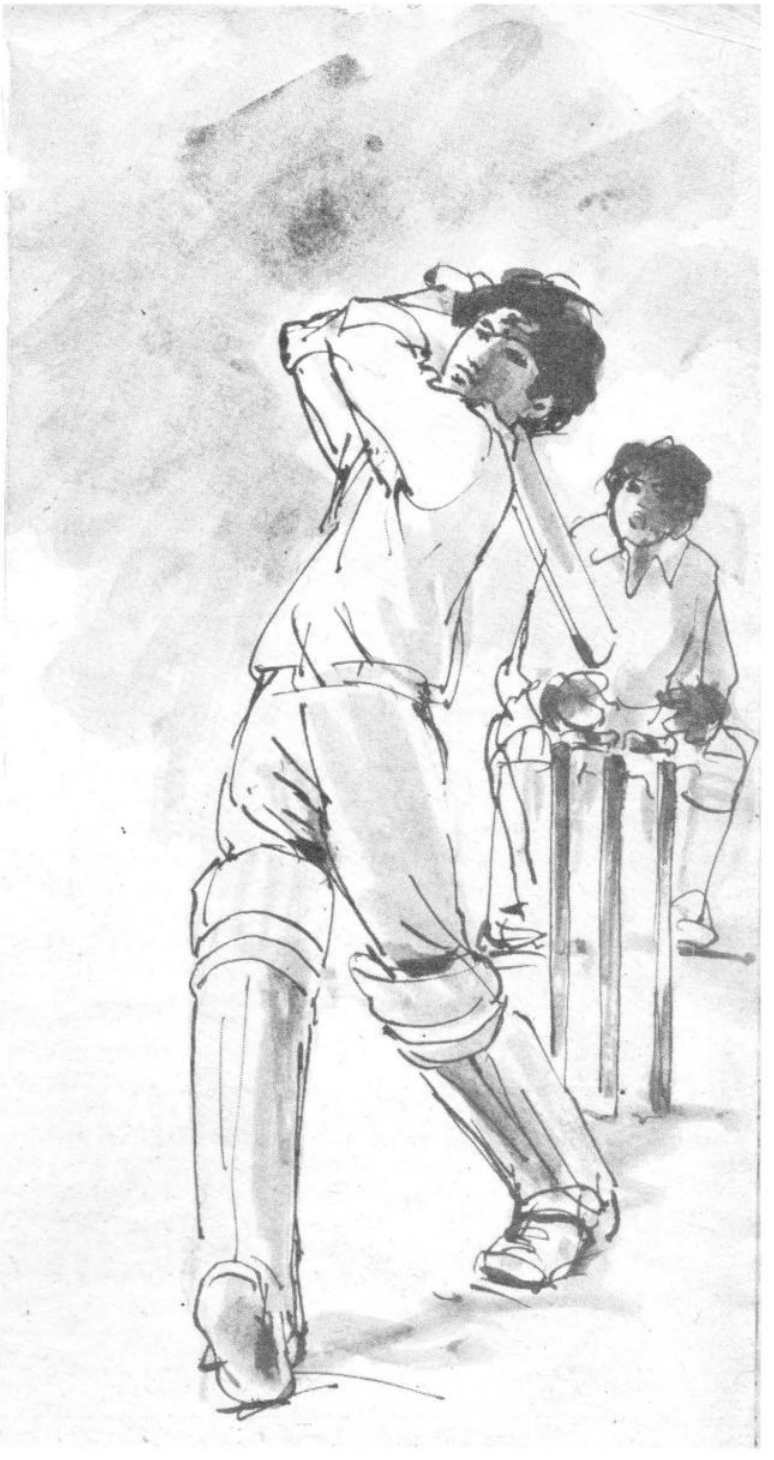

সমীর ওভারের তৃতীয় বলটা দিতে প্রায় স্ক্রীনের কাছা-কাছি চলে গেছে। অত দূর থেকে দৌড়ে এসে বল করলে সে বল যে কী মারাত্মক জোরের বল হবে তা ভাবতেই মনোজের পেটটা গুলিয়ে উঠল।

চারদিকের মাঠ স্তব্ধ। সমীর জেট প্লেনের মতো দৌড়ে আসছে। এসে বাঁই করে হাত ঘোরাল।

বলটা একবার দেখতেও পেল না মনোজ। একটা আবছা লাল ফিতের মতো কী যেন সড়াক করে পীচের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। বেকুবের মতো মনোজ দাঁড়িয়ে থাকে। স্লিপের ফিলডাররা হাসছে।

আবার সমীর দৌড়ে আসে। বল করে। আবার সেই লাল ফিতের মতো লম্বাটে একটা ছায়া দেখতে পায় মনোজ। কিন্তু

হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টি

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টি
মজাদার নামটি
হাতে তার আংটি
হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টি
হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টি
চড়ে ছোট ট্রামটি
পেঁছিল গ্রামটি
হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টি
হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টি
রেগে মেগে আন্‌টি
টেনে ধরে কানটি
হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টি
হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টি
খাসা তার নামটি
আরও খাসা আংটি
তবু তার আন্‌টি
কামড়ায় কানটি।
যায় ছেড়ে গ্রামটি
চড়ে ছোট ট্রামটি
হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টি

এমন সাঙ্ঘাতিক তার গতি যে ব্যাটটা তুলবারও সময় হয় না।

মনোজের ভাগ্য ভাল যে, দুটো বলই ছিল বাইরের।

সে আবার ব্যাট আঁকড়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হাত পা ঝিম ঝিম করে, চোখে অন্ধকার -অন্ধকার লাগে। স্ক্রীনের কাছ থেকে সমীর ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো দৌড়ে আসছে।

মনোজের একবার দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হল। অনেক কষ্টে সে ইচ্ছে দমন করে প্রাণপণে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে সে সমীরের বল করার কায়দাটা দেখতে লাগল।

সমীরের হাত যখন ঘোরে তখন ঠিক সিলিং ফ্যানের মতো ঘূর্ণায়মান চক্রের মতো দেখায়।

এবার লাল ফিতেটা বাইরে দিয়ে গেল না। সোজা চলে এল মনোজের দিকে। গুড লেংথে পড়ে মিডলস্টাম্পে।

মনোজ ব্যাট তোলেনি, হাঁকড়ায়নি, কিচ্ছু করেনি। বলটা এসে আপনা থেকেই ব্যাটটাকে একটা ঘুঁষি মেরে অফ-এর দিকে গাঁড়িয়ে গেল।

একটা বল আটকেছে মনোজ, তাইতেই হাততালি পড়ল চারদিকে।

সমীর শেষ বলটা করতে আসছে। একইরকম গতিবেগ। তবে এখন মনোজের অতটা ভয় করছে না।

এ বলটাও সোজা এল। একটু শর্ট পীচ পড়ে কোমর সমান উঁচু হয়ে লেগ-এর দিকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মনোজ ব্যাটটা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ভেগে-যাওয়া বলটা জোর চাপড়ে দেয়। সেই চাপড়ানিতে বলটা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এক লাফে বাউন্ডারি ডিঙিয়ে আরো পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে পড়ল। ছক্কা।

হাততালির তুমুল শব্দে কানে তালা লাগবার জোগাড়।

পরের ওভারে বল করল সরোজ। এইট-এর ওপেনিং ব্যাট ষষ্ঠীব্রত সে ওভারটা খুটখাট করে কাটিয়ে দিল। রান হল না।

পরের ওভারে আবার সমীর বল করতে আসে, মনোজ ব্যাট করবে।

চারিদিক থেকে চিৎকার ওঠে, "মনোজ আর একটা ছক্কা চাই।"

আগের ওভারে একটা ছক্কার মার খেয়ে সমীরের শরীরে আগুন লেগে গেছে। সে তিনগুণ জোরে দৌড়ে এসে যে বলখানা দিল তা অ্যাটম বোমের মতো। কিন্তু মনোজের বুকের দুরদুরুনিটা এখন নেই। হাত-পাও বেশ বশে এসে গেছে। চোখেও কিছু খারাপ দেখছে না।

অফ স্টাম্পের ওপর বলটা ছিল। মনোজ পা বাড়িয়ে ব্যাটখানা পিছনে তুলে বলটার ঠিক ব্রহ্মতালুতে ব্যাটখানা দিয়ে চাপড়াল। বলটা মাটিতে একটা ঠোকর খেয়ে স্লিপের মাঝখান দিয়ে সে কি পড়ি মড়ি দৌড়, যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

বাউন্ডারি। হাততালি। চিৎকার।

পরের বল মিডল স্টাম্পে, গুড লেংথ। সাধারণত ব্যাটসম্যান এ বল আটকায়। মনোজের এখন আর আটকানোর কথা মাথায় আসছে না। মার না পড়লে সমীরের ধার ভোঁতা হবে না। পিচে পড়ে বলটা ওঠার মুখে, মনোজ এগিয়ে সেটাকে অন ড্রাইভ করল। সমীরের জোরালো বল সে মার সইতে পারল না, বন্দুকের গুলির মতো মাঠের বাইরে বেরিয়ে গেল।

লাইনের ধারে লোকেরা ভীষণ চেঁচাচ্ছে, ছেলেরা লাফাচ্ছে, স্বয়ং তারকবাবু নিয়ম ভেঙে দু দুবার মাঠের মধ্যে ছুটে এসেছিলেন, তাঁকে হেড স্যার এসে ধরে নিয়ে গেলেন।

মনোজ এখন আর অন্য কিছু দেখছেও না, শুনছেও না। তার সমস্ত মন চোখ এখন বলের দিকে। একের পর এক বল আসে আর মনোজ এগিয়ে পিছিয়ে, শরীর বাঁকিয়ে নানা কায়দায় কেবল পেটায়। তার মারমূর্তি দেখে সমীরের বল একদম ঝুল হয়ে গেল। দশ ওভারের পর হাঁফাতে হাঁফাতে তার জিব বেরিয়ে গেছে, মনোজ তখন আশি ছাড়িয়ে গেছে। টোটাল বিরানব্বই। এর মধ্যে শুধু ষষ্ঠীব্রত আউট হয়েছে। আর কোনো ঘটনা ঘটেনি।

মফস্বলের স্কুলের খেলায় লাঞ্চ বা টি হয় না। এক নাগাড়ে খেলা চলে। এক ইনিংসের খেলা একদিনেই শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় ইনিংস বলে কিছু নেই।

কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছিল, ক্লাস এইট-এর ব্যাটের দাপট আজকে কমবে না। এক ইনিংসও আজ শেষ হবে না।

মনোজ সমীরকে তিন তিনটে চার মেরে নবদুইয়ের কোঠায় ঢুকে গেল। স্কোরাররা তাল রাখতে পারছে না রানের গতির সঙ্গে।

ওদিকে দর্শকদের মধ্যে একজন কালো চশমা পরা গম্ভীর মানুষ এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গলায় দূরবীন, কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে। কোমরে পিস্তলের খাপ আছে বটে কিন্তু তাতে পিস্তল নেই। বরদাচরণ মনোজ আর সরোজকে জেরা করতে এসেছেন।

কিন্তু খেলা ভাঙার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বলে তিনি খুবই বিরক্ত, বার বার ঘড়ি দেখছেন। একবার ধৈর্য হারিয়ে বলেই ফেললেন, "দূর ছাই, ছেলেটা কি আউট হবে না নাকি!"

পাশেই তারকবাবু ঘাসের ওপর বসে জুলজুলে চোখে মনোজের খেলা দেখছেন। বরদাচরণের কথা শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, "কী! কী বললেন মশাই?"

ল্যাকপ্যাকে রোগা হলেও তারকবাবুকে তখন হুবহু খুনীর মতো দেখাচ্ছিল।

বরদাবাবু ভয় খেয়ে বললেন, "মানে, ইয়ে..."

তারকবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "ইয়ার্কি পেয়েছেন মশাই? ক্রিকেটের মতো সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ইয়ার্কি? কোন আক্কেলে আপনি ঐ অলক্ষুনে কথা বললেন?"

চেঁচামেচিতে মুহূর্তের মধ্যে বরদাচরণের চারধারে ভিড় জমে গেল। স্বয়ং ডি এস পি এগিয়ে এসে বললেন, "আরে! এ যে দেখছি সেই কমিক্যাল গোয়েন্দা ভদ্রলোক! কী করেছেন উনি?"

তারকবাবু আগুন হয়ে বললেন, "ইনি চাইছেন মনোজ আউট হয়ে যাক।" বরদাচরণের কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। লোকজন চারদিক থেকে আওয়াজ দিচ্ছে। একজন সিটি দিল, অন্যজন বলে উঠল, "ওরে, দ্যাখ দ্যাখ গোয়েন্দাচরণের পিস্তলের খাপ ফাঁকা!" আর একজন এসে বরদাচরণের দূরবীনটা তুলে দূরের জিনিস দেখতে লাগল। সানগ্লাসটা খুলে নিল একজন।

চাক্কু মামার দূরবস্থা দেখছিল দূর থেকে। সে আরো একটা জিনিস লক্ষ করে রেখেছে। সে লক্ষ করেছে ক্রিকেট মাঠের বাইরে ঘাসজমিতে মনোজদের কুখ্যাত দুষ্টু গরু হারিকেন চরে বেড়াচ্ছে।

চাক্কু কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে হারিকেনের দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে মনোজের নিরানব্বই। সমীর সরে গেছে অনেক আগে। একটা আনাড়ি ছেলে বল করতে আসছে। একটা রান অনায়াসে হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে চারদিক থেকে তুমুল চিৎকার উঠল। বোলার ছেলেটা তার দৌড়ের মাঝপথে হঠাৎ বাঁ দিকে ঘুরে প্রাণপণে মাঠের বাইরে ছুট লাগাল। আম্পায়ার অঙ্ক স্যার একটা স্টাম্প উপড়ে বাগিয়ে ধরে তারপর কী ভেবে স্টাম্পটা হাতে করেই দৌড়তে থাকেন।

হতভম্ব মনোজ প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারেনি। তারপরই দেখতে পেল, তাদের গরু হারিকেন বাঁ ধারে লাইনের পাশে প্রায় আটদশজনকে গুঁতিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে, তারপর মাঠে ঢুকে দুজন ফিল্ডারকে ধরাশায়ী করে এখন পীচের দিকে ছুটে আসছে। তার মুখে ফেনা, চোখ লাল, ফোঁস ফোঁস শ্বাস ছেড়ে বাঘের গলায় 'হাম্বা' ডাক ছাড়ছে।

তার সেই মূর্তি দেখে মুহূর্তে মাঠ ফাঁকা। ডি এস পি, সিভিল সার্জেন, হেড স্যার কে কোথায় গেলেন কে জানে! চারদিকে জড়ামড়ি করে কিছু ছেলে আর লোক পড়ে গেছে মাঠে। হারিকেন মনোজকে চেনে, কাজেই সে মনোজের দিকে দৃকপাত না করে সোজা মাঠের লাইনের ধারে দর্শকদের দিকে ছুটে গেল।

বরদাচরণ পিস্তলের খাপে হাত বাড়িয়ে বড় হতাশ হলেন। তাই তো! হারিকেন আর কাউকে না ধরে কী করে যেন বরদাচরণকেই টারগেট বানিয়ে তেড়ে গেল।

অসমসাহসী বরদাচরণ পালানোর চেষ্টা করেও পারলেন না। দেয়াল থেকে পড়ে হাঁটুতে চোট। সুতরাং তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। হারিকেন তেড়ে এসে ঢুঁ মারতেই বরদাচরণ বাঁ পাশে সরে গেলেন। আবার ঢুঁ। বরদা আবার ডানপাশে সরলেন।

দারুণ জমে গেল খেলা। বরদাচরণ ভারসাস হারিকেন। ক্রিকেটের কথা ভুলে লোকজন বুলফাইট দেখতে আবার ভিড় জমিয়ে ফেলল। (ক্রমশ)

ঝন্টু-মন্টুর গল্প

চিত্র- পরাগ রায়
বয়স- ১০ বছর

এই শহরটা ঝন্টু-মন্টুদের মত তোমারও। এই শহরের ভালো মানে তোমারও ভালো,— ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ)

চিৎ হওয়া উচিত নয়

এক দৌড়ে ঘরে ঢুকল টুম্পি। ঢুকেই বলল : কাকু, কান বন্ধ করো, এক্ষুনি কিন্তু মার চিৎকার শুনতে পাবে।

কাপ-ডিস ভেঙেছিস বুঝি আবার?

তুমি তো শুধু কাপ-ডিস ভাঙতেই দেখছ। তা নয়, রেগেছে দাদার ওপর। সেই সকাল থেকে চিৎ হয়ে পড়ে আছে তো!

ডাক্ ডাক্, ডেকে আন্ শীগগির। এত বেলা অব্দি বিছানায় পড়ে থাকে কেউ?

যদি-বা থাকে, চিৎ হয়ে থাকা কি উচিত? বলো?

বলতে বলতেই অবশ্য নন্তু এসে হাজির হলেন। এক পশলা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। মুখখানা বেশ থমথমে। আর তাই দেখে 'চিৎ হওয়া উচিত না, চিৎ হওয়া উচিত না' বলে লাফাতে শুরু করল টুম্পি।

নন্তু জিজ্ঞেস করল : কুস্তির নিয়ম শেখাচ্ছিস না কি?

আবার না ওদের ঝগড়া শুরু হয় সাতসকালে! এই ভেবে বলে উঠলাম আমি : কুস্তির নিয়ম নয়, বানানের নিয়ম।

ওঃ, একঘরে মার চিৎকার, অন্যঘরে তোমার বানান! কোথায় যে যাই।

কোথাও যেতে হবে না, এইখানে বোস্। বল্ তো, উচিতের ত-টা পুরো না খণ্ড?

টুম্পি একেবারে হাঁ হয়ে গেল। পুরো না খণ্ড? তার মানে কী?

মানে জানিস না? খণ্ড ত শুনিসনি কখনো? সেই-যে, ত-য়ে হসন্ত দিলে যা হয়। ত দেখেছিস, ৎ দেখিসনি কখনো?

ও, ওইটে বুঝি ত-য়ে হসন্ত? জানতাম না তো?

সবজান্তার সুরে নন্তু বলে : কোন্‌টাই-বা তুই জানতিস?

তুমি তো জানো, তাহলেই হলো। বলো না দেখি, উচিত বানান কী?

খণ্ড ত, আবার কী!

ঠিক হয়েছে কাকু?

কই আর হলো! চিৎ আর উচিত কি এক? চিৎ খণ্ড, কিন্তু উচিত পুরো।

তাই? কেন?

কারণ একটা আছে অবিশ্যি। কিন্তু সে কি ঠিক বুঝতে পারবি? উচিতের মধ্যে একটা প্রত্যয় লুকোনো আছে, ক্ত। যা-কিছু হয়ে গেছে, সেইটে বোঝাবার জন্যে এই প্রত্যয়টা লাগে। আর এটা থাকলে কখনো ৎ হতে পারে না। যেমন ধর্, অতীত। এখানে কি খণ্ড ত বলবি? তেমনি, মোহিত বিহিত বিজিত অজিত...

'এইযা,' মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল টুম্পি, 'আমি যে এতদিন ভাবতাম সত্যজিৎ খণ্ড ত দিয়ে লিখতে হয়।'

ঠিকই জানতিস। সত্যজিৎ তো খণ্ডই।

নন্তু বলল : ওরেব্বাবা, অত বড়ো লোকটাকে তুমি খণ্ড বলছ?

ওর প্রলাপে কান না দিয়ে বলি : যাকে জয় করা হয়েছে, বিজিত। যাকে জয় করা যায় নি, অজিত। আর অন্যদিকে, সত্যকে জয় করে যে, সে হলো সত্যজিৎ। তেমনি ইন্দ্রজিৎ। এ হলো আরেক প্রত্যয়, ক্বিপ্।

তার মানে ৎ দেখলেই বলব ক্বিপ্?

না না, তা কেন। অন্য রকম ভাবেও খণ্ড ত হয়। যা-কিছু হয়ে গেছে তার জন্য চাই ক্ত, যেমন অতীত। আর যা-কিছু হবে তার জন্য চাই ক্যপ্, যেমন 'ভবিষ্যৎ'। ভবিষ্যৎ-ও তাহলে খণ্ড হয়ে গেল।

এটা কাকু ঠিক বলছ না। আমি একটা আধুনিক কবিতার বই দেখেছি তাতে লেখা আছে 'স্মৃতিসত্তাভবিষ্যত'।

আহা, সে তো ছাপার ভুল লেখার ভুল হয়েই যায় অনেক সময়ে। হয় না? ওটাও হঠাৎ গোলমাল হয়ে গেছে একটু। ভবিষ্যত কখনো নয়, ভবিষ্যৎ। জগত কখনো নয়, জগৎ। যা চলছে, গম্ ধাতু আর ক্বিপ্, হলো জগৎ।

কী কুৎসিত এই ধাতুপ্রত্যয় ব্যাপারটা!

আচ্ছা, লেখ্ তো 'কুৎসিত'।

স্লেটের ওপর বড়ো বড়ো করে লিখল নন্তু! কুৎসিৎ।

যা ভেবেছিলাম!

ভুল করেছি?

ভুল নয়? কুৎসা আর ক্ত, হলো কুৎসিত। শেষটা তাহলে খণ্ড ত হবে কেন?

টুম্পি বলল : যেমন অসিত। তাই না কাকু?

নারে, ওটা আবার একটু আলাদা। সিত মানে জানিস? শাদা। তার উলটো হলো অসিত, কালো।

শাদাকালো? আঃহা, কোথায় যেন, কোথায় যেন পড়েছিলাম 'সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি!' কোথায় বলো তো?

মুকুন্দরামে। ফুল্লরার বিলাপ ছিল ওটা।

শুনে, আবার বিছানার ওপর চিৎপাত হয়ে পড়ল নন্তু।

টিনটিন বোম্বেটে জাহাজ

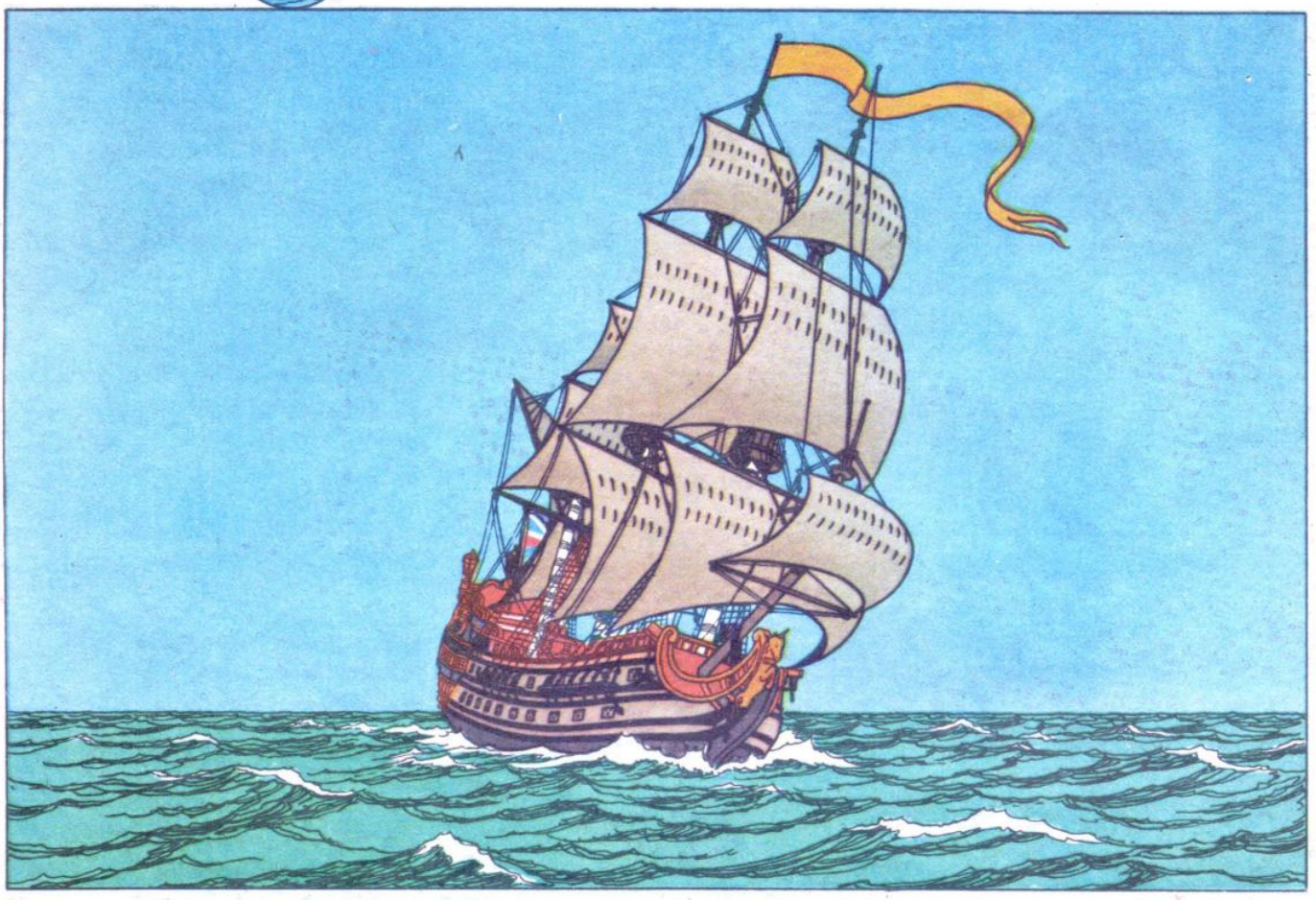

জলদস্যু।

জলদস্যু! বোম্বেটে! সবাই তৈরী থাকো!

বোম্বেটে জাহাজের মুখোমুখি হয়ে ইউনিকর্ন এখন কী করবে?

উঃ, ওদের সঙ্গে তো ছুটে পারব না!

তাহলে বুদ্ধির দৌড়ে ওদের হারাতে হবে! তার জন্যে ইউনিকর্ন এখন কী করবে জানো?

গতিবেগ কমাও! গোলন্দাজদের তৈরী থাকতে বলো।

ইউনিকর্ন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল! বোম্বেটেরা তো ব্যাপার দেখে হতভম্ব!

গোলা চালাও!

(এর পর বিয়াল্লিশের পাতায়)

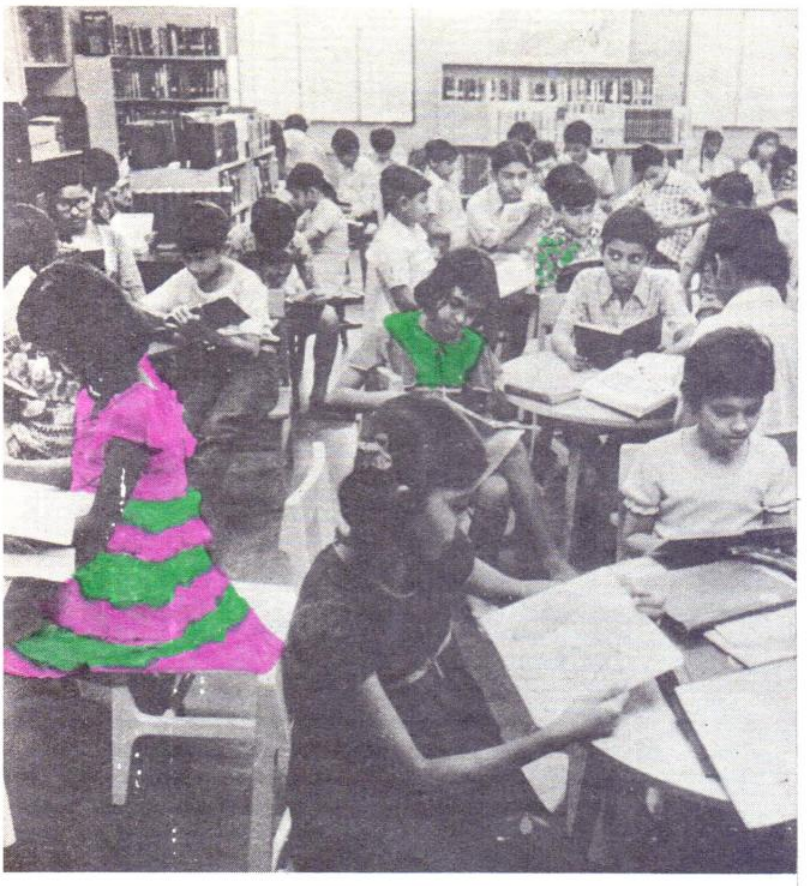

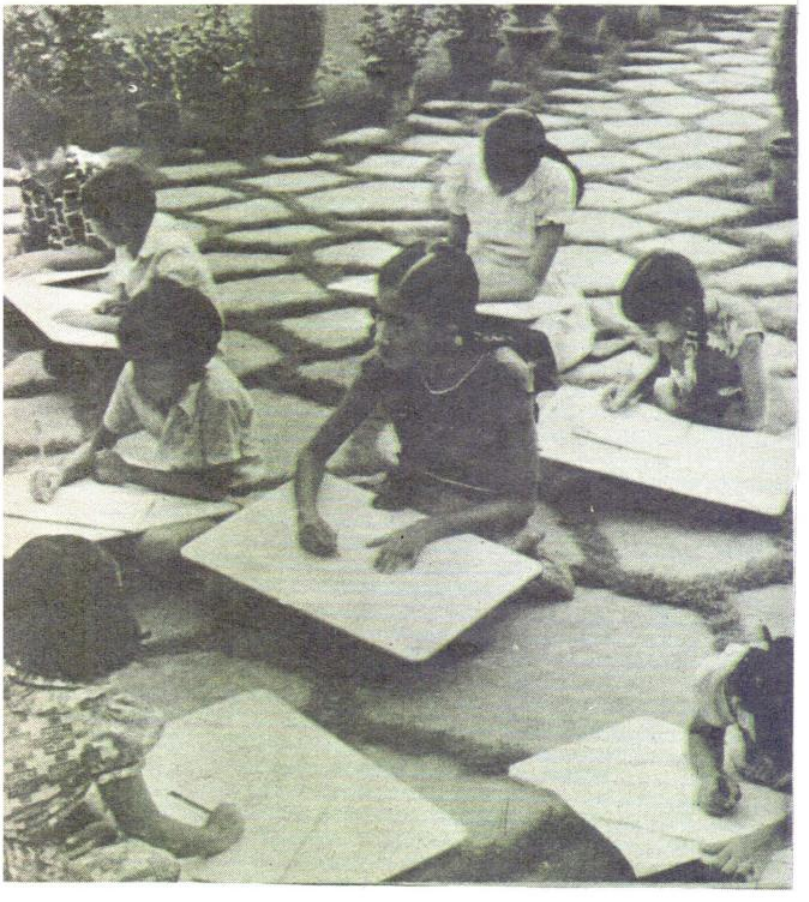

আমাদের কলকাতা

রত্নাকর

পেনসিলের টানে, তুলির আঁচড়ে সাদা কাগজের ওপর বিচিত্র এক জগতের ছবি ফুটে উঠছিল। সে জগতে পাখি আছে, গাছপালা আছে, মানুষ আছে, যা কেউ কখনও দেখেনি তাও আছে। দেখতে-দেখতে মনে হয় এত সত্যি বোধহয় আর কিছু নয়। যারা ছবি আঁকছিল তাদের বয়েস কত হবে, বড় জোর আট-দশ। সবাই মিলে ছবি আঁকছিল রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের ক্লাসে বসে। মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারির ডাইরেকটর এবং বিশিষ্ট শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ছোটদের চোখের ওপর আমরা আমাদের চোখ বসিয়ে দিতে চাই না, যার যা ইচ্ছে তাই আঁকুক, এই ভাবেই ওরা আস্তে আস্তে নিজেদের পথ পেয়ে যাবে। তবে রং-তুলির ব্যবহার ও অন্যান্য মাধ্যম ওদের শিখিয়ে দিই, দরকার মতো সবরকম সাহায্য করি। ছবি-আঁকার ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এখন চল্লিশ। ছয় থেকে নয়, আর দশ থেকে ষোলো—বয়েস অনুসারে এই দুই ভাগে ওদের ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। বিকেল-সন্ধের দিকে ওদের ক্লাস হয়। ক্লাস নেন রামানন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু কাগজের ওপর নয়, মাটির পাত্রেও ছবি আঁকা শেখানো হয়, সে-সব কাজের কিছু-কিছু রেখে দেওয়া হয়েছে ক্লাসের দেওয়াল-আলমারিতে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের রামকৃষ্ণ মিশনের মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারিতে নিয়মিত নিয়ে যাওয়া হয়। ছবি কী ভাবে দেখতে হয়, কী ভাবে বুঝতে হয়, কোনটা কী কাজ, শেখানো হয় প্রত্যেককে। ছবি আঁকার সঙ্গে-সঙ্গে ভাল ছবি দেখার চোখও তৈরি হয়ে ওঠে এইভাবে। মিউজিয়াম এবং আর্ট গ্যালারিটি চমৎকার, সম্প্রতি ঢেলে সাজানো হয়েছে। এটি প্রধানত বড়দের, তবে ছোটরাও নিরাশ হবে না। রামকৃষ্ণ মিশনের ছোটদের গ্রন্থাগারটিও দেখার মতো। কত বই, আলমারি আর র‍্যাক বইতে ঠাসা। সব বই-ই ছোটদের। জীবনী-গ্রন্থ, অ্যাডভেঞ্চার, গল্প-কবিতা-উপন্যাস—কী না আছে! এখানে বসে পড়ার চমৎকার ব্যবস্থা আছে, আবার বাড়িতেও বই নিয়ে যাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক সন্ধেতেই ঝাঁক বেঁধে এখানে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা আসে, কেউ যায় গ্রন্থাগারে, কেউ যায় ছবি আঁকার ক্লাসে। গোল পার্কের এই মিশনে শিশুমনের খাদ্যের অভাব নেই, সে-সব খাদ্যও আবার রীতিমত পুষ্টিকর।

মণিমেলার খবর

আঞ্চলিক সংবাদ

বনগাঁ আঞ্চলিক আন্তঃমণিমেলা কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতা গত ১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল। ফলাফল : ১ম—প্রভাত; ২য়—সীমন্তিকা; ৩য়—সূর্যসেন স্মৃতি ও ৪র্থ—শরৎ স্মৃতি। শ্রেষ্ঠ আদেশদানকারী বিবেচিত হন প্রভাত মণিমেলার শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী।

মণি সন্দেশ

শিবপুরের স্বামীজী মণিমেলার ২১তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ১৩ আগস্ট সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বার্নপুরের বেণীস্মৃতি মণিমেলার ১০ম প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে ১৬ আগস্ট এক আকর্ষণীয় ক্রীড়া-প্রদর্শনী হয়। কল্যাণীর অনামিকা মণিমেলার ৮ম বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয় ২৪ আগস্ট। হুগলীর আরামবাগ বিবেকানন্দ মণিমেলার ৭ম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব ২১ থেকে ২৩ আগস্ট শিল্প প্রদর্শনী ও নাট্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে। কল্যাণীর অনিন্দিতা মণিমেলার ৫ম বার্ষিক উৎসব পালিত হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বার্নপুরের শ্যামলিমা মণিমেলার ১ম বর্ষপূর্তি উৎসবে অনুষ্ঠানসূচী ছিল রীতিমত আকর্ষণীয়। বরানগরের রবীন্দ্রনগর মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়া প্রদর্শনী ১২ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন প্রকারের দেশী ও বিদেশী ড্রিল, ব্রতচারী ও নানা প্রদেশের লোকনৃত্যের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

কবি নজরুলের মহাপ্রয়াণে মণিমেলাগুলি বিভিন্ন স্মরণসভায় মিলিত হয়। যাদের অনুষ্ঠানের খবর এখন পর্যন্ত এসেছে, তারা হল : অনির্বাণ (যাদবপুর), ব্লুস্টার (গড়ফা) এবং বেণী স্মৃতি মণিমেলা (বার্নপুর)। দমদম ক্যান্টনমেন্টের রবীন্দ্রনগর মণিমেলা ৩ আগস্ট দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ১১৩তম জন্মদিবস যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করেছে। লাভপুরের তারাশংকর মণিমেলা তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৭৯তম জন্মোৎসব ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে। কৃষ্ণনগরের সুপ্তোত্থিতা মণিমেলা ১১ আগস্ট নিষ্ঠার সঙ্গে শহীদ ক্ষুদিরামের মৃত্যুদিবস পালন করে। দমদমের পূর্বাচল মণিমেলা ২২ আগস্ট বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বরে এক শিক্ষাভ্রমণে গিয়েছিল। শ্যামনগরের আতপুর বৈশাখী মণিমেলার কর্মীরা ২৩ সেপ্টেম্বর এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় ৩-১ গোলে মণিভাইদের পরাজিত করে। সম্প্রতি রাখীবন্ধন উৎসব ও স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের আরও কিছু খবর এসেছে। যে সব মণিমেলা এই উৎসবগুলি পালন করেছে তারা হল : কৃষ্টি (দুর্গাপুর), পূর্বাচল ও বেণী স্মৃতি মণিমেলা।

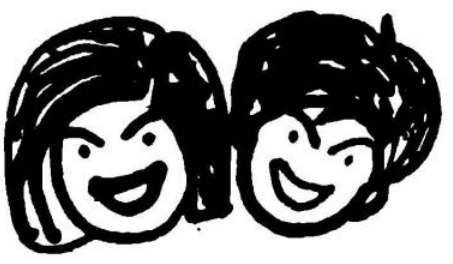

ভাবতে পারো?

রিপলি

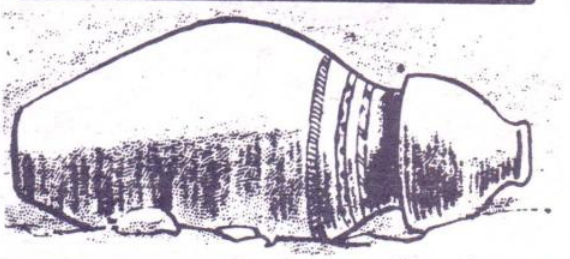

ককেশাসের ধনী গ্রীকদের কফিন হিসেবে যেগুলি ব্যবহৃত হত, আদতে সেগুলি ছিল বড়-বড় পিপে!

ফ্লোরেন্সবাসী জর্মান ফিলিপ ভন্ স্টষ্ (১৬৯১-১৭৫৭) ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে মনোকুল্ (একচোখের চশমা) আবিষ্কার করেছিলেন। না, কোনো ফ্যাশনের জন্যে নয়, তাঁর দুচোখের দৃষ্টিশক্তির মধ্যে তারতম্য ছিল।

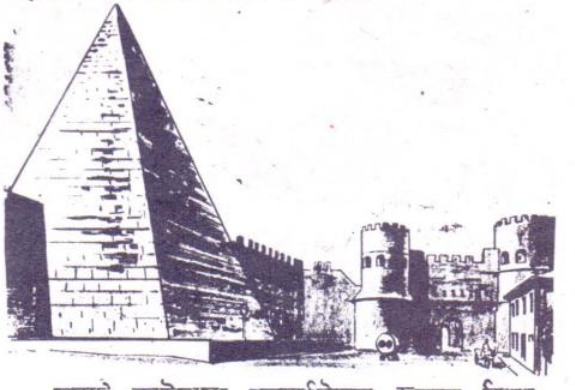

সম্রাট কাইয়াস্ সেস্টিয়াস হুকুম দিয়েছিলেন যে, তাঁর স্মৃতিস্তম্ভটি ঠিক তিনশ তিরিশ দিনের মধ্যে বানাতে হবে। ইতালির রোমে একশ একুশ ফুট উঁচু সেস্টিয়াসের পিরামিডটি ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়েছিল!

(উনচল্লিশের পাতার পর)

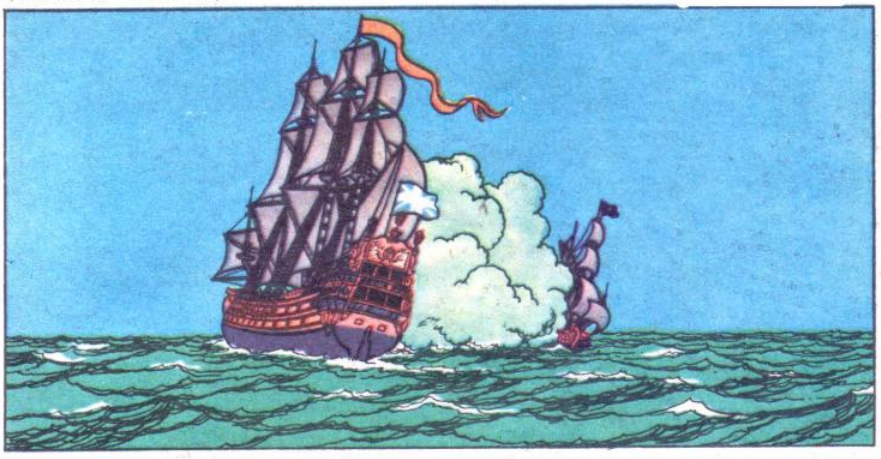

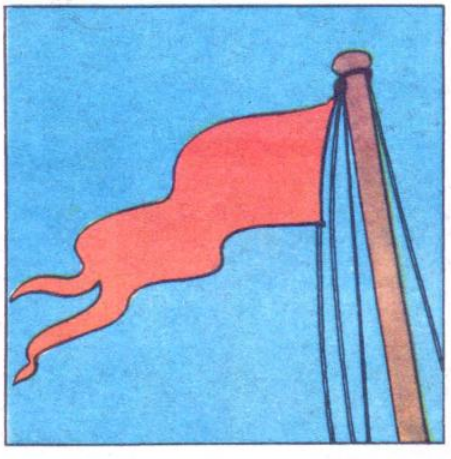

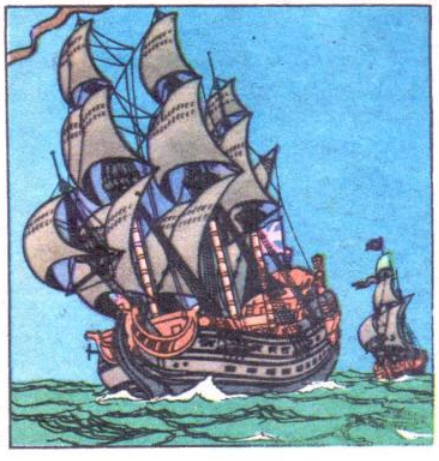

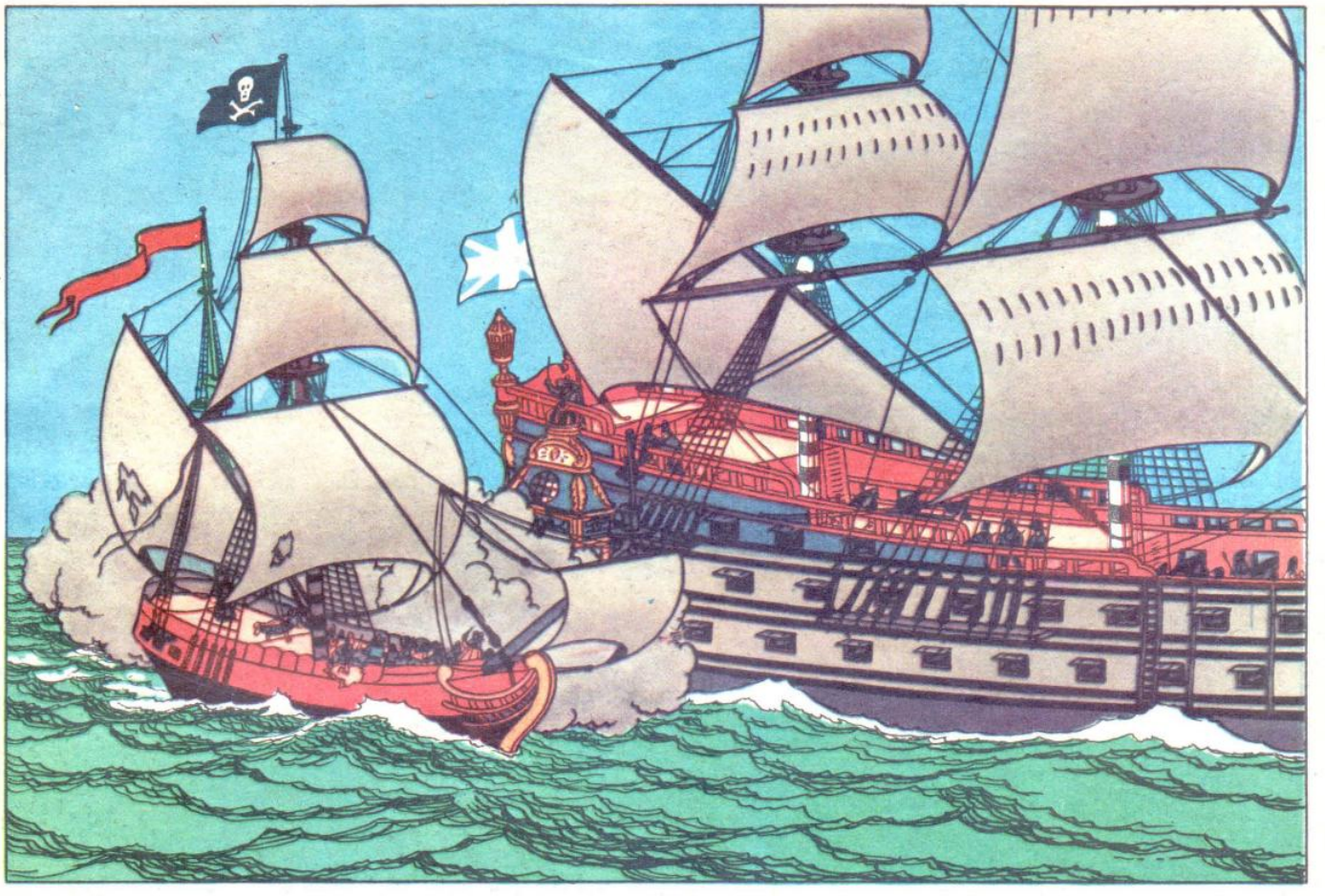

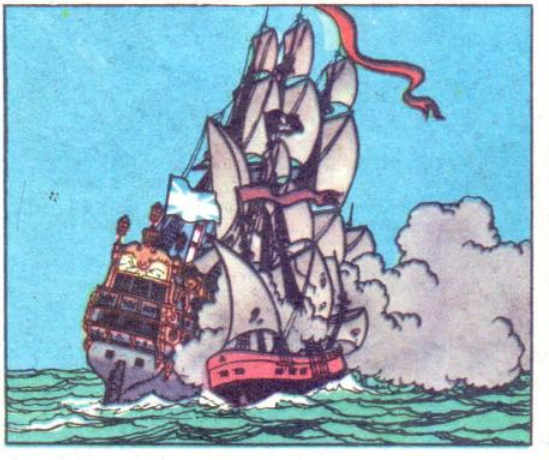

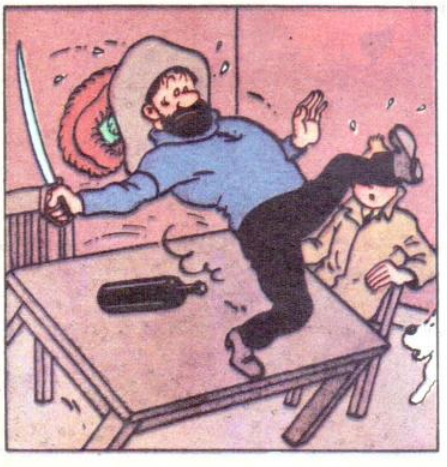

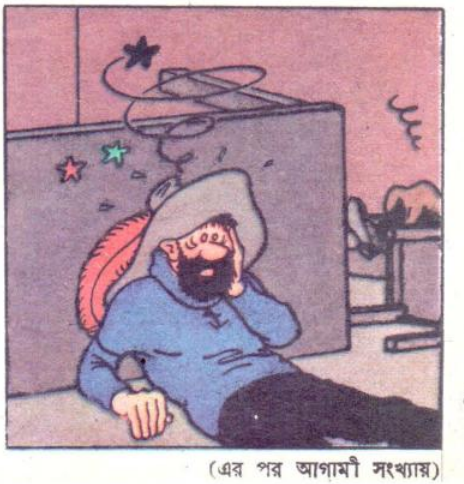

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

শেখো কারিগর

পেপার ম্যাসে বা মণ্ডনের কাজ

কাগজের মণ্ডন বা টুকরো দিয়ে মুখোশ তৈরি করতে হলে জোগাড় করা জিনিসের সঙ্গে যোগ করো—মাটির সরা, একটা কাঠের পাটা আর মাটি।

যে ছাঁদের মুখোশ করবে, তার ছক আগেই ঠিক করে নাও।

কাজ শুরু করো। মাটির সরাকে উপুড় করে ভেজা টুকরো কাগজের পরত দিয়ে ঢেকে দাও। কাগজের জল একটু শুকিয়ে এলেই সারা গায়ে ভালমতো পাতলা লেই মাখিয়ে পরত দাও। একইভাবে তোমার দরকার-মতো পুরুর জন্য কাগজ লাগাও। শুকিয়ে গেলে একটু টান দিলেই কাগজের তৈরি সরা হাতের ওপর উঠে এলে তার চারপাশ কাঁচি দিয়ে সমান করে নিয়ে শিরীষ কাগজ দিয়ে মেজে, ছক অনুযায়ী রং আর ভারনিস দিয়ে শেষ করো।

এই সরার মুখোশ ছাড়া, মুখের আকার অনুযায়ী মুখোশ গড়তে হলে, কাঠের পাটার ওপর মাটি চাপিয়ে তোমার মনের মত মুখ গড়ে নিয়ে যেমনভাবে সরার ওপর কাগজ চাপালে, তেমনভাবেই কাগজ চাপিয়ে শেষ করবে, কেবল শেষ পরত দেবে পাতলা কাপড় দিয়ে, যাতে মুখোশ আরও শক্ত হয়। পুরুলিয়ার বিখ্যাত ছৌ-নাচের মুখোশ সব এমন ভাবেই তৈরী। ওঁরা কেবল শেষে গোলা মাটির প্রলেপ দিয়ে নেন। একই মুখের বেশ কিছু ছাঁচ নিয়ে রং আর তুলির আঁচড়ের তফাতে নানান মুখের ভিড় গড়ে তুলতে পারো। নিজেদের নাটক, নাচ আর প্রয়োজনের মুখোশগুলো নিজে তৈরি করে নিতে পারার মত আনন্দ আর নেই।

জেনে রাখো—(১) মুখোশকে বেশী উজ্জ্বল করার ইচ্ছে হলে, বাজার থেকে নানান ধরন আর রঙের কাগজ, জগজগা অর্থাৎ রাংতা কাগজ আর পুঁতি এনে প্রয়োজন-মতো ব্যবহার করতে পারো।

(২) মুখোশ হয়ে গেলে, নাক, চোখ আর কানের ফুটো মাপমতো করে নেবে।

(৩) মুখে মুখোশ পরিয়ে কখনও ফুটো করতে যেও না। কেননা, সেটা খুবই বিপজ্জনক।

আঁকো রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

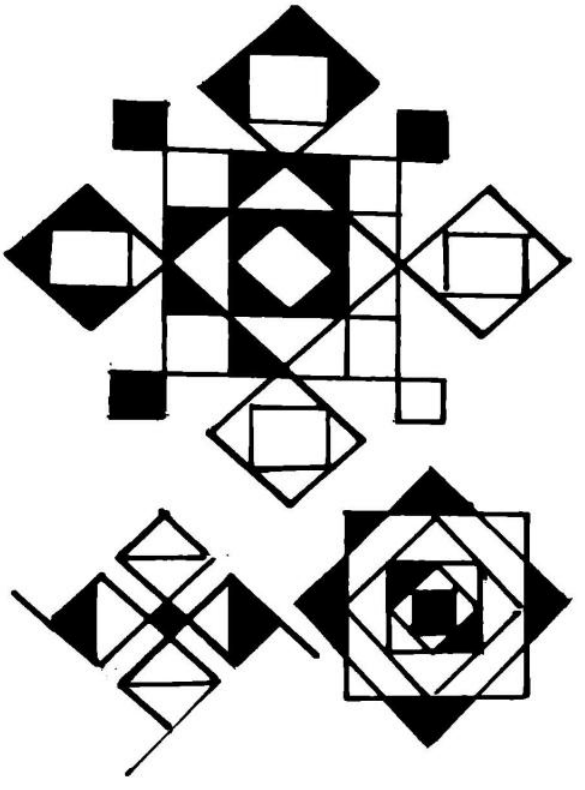

এক আকার, অনেক নকশা

এবারও এক আকারে সামান্য কয়েকটা নমুনা তোমাদের সামনে তুলে ধরলুম। এই চৌকো আকারের কম-বেশির ভেতর দিয়ে অসম্ভব সুন্দর-সুন্দর সব নক্‌শা হতে পারে, যার কোন শেষ নেই। শুরু করে দেখই না, কত ধরনের নক্‌শা ধরে রাখতে পারো নিজের খাতায়।

আর এই সব চৌকো খোপে খোপে নানান রঙের ছোপ ধরিয়ে আরও সুন্দর করে তোলো তোমার ভাবনাগুলোকে। ইচ্ছে করলে রং ছাড়া রঙীন টুকরো কাগজও বসিয়ে দেখতে পারো।

দড়ি কাটার খেলা

জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

এবার তোমাদের দড়ি কেটে জোড়া লাগাবার ম্যাজিক শেখাব। তোমরা যারা ম্যাজিক ভালবাস, তারা নিশ্চয়ই কোথাও-না-কোথাও এই খেলা দেখেছ।

বড় বড় ম্যাজিশিয়ানরা—ক্যাঁচ করে দড়ি কেটে ফেলে কেমন মন্তর মতো তা আবার জোড়া লাগিয়ে দেন। মনে রাখবে, সে-রকম দেখাতে অনেক অভ্যাস, অনেক লেখাপড়া আর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তার সংগে আজ যেটা শেখাচ্ছি তার তুলনা করো না, বা দুটোকে মিলিয়ে ফেলো না। তোমাদের যেটা শেখাচ্ছি সেটা হল তোমাদের জন্য বিশেষভাবে লিখিত—সহজতম পদ্ধতি।

জাদুকরের হাতে একটা সাধারণ দড়ি রয়েছে। তার দুপ্রান্ত এক জায়গায় করে গিঁট বাঁধা আছে। জাদুকর একটা কাঁচি নিয়ে ঐ দড়িটার মাঝামাঝি এক জায়গায় কেটে ফেললেন, অর্থাৎ দড়িটা যদিও গিঁট বাঁধা রয়েছে, তবুও বোঝা যাচ্ছে সেটা দু টুকরো হয়ে গেছে। এবারে জাদুকর কাঁচি দিয়ে ঐ গিঁটটাকে কেটে ফেললেন। সেটা কেটে গিয়ে টুপ করে খসে পড়ল, কিন্তু কী আশ্চর্য, দড়ির টুকরো দুটো জোড়া লেগে একটা হয়ে গেছে। সবাই অবাক।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছ কীভাবে সম্ভব এটা। খেলাটা কিন্তু খুবই সহজ। বুঝে একটু অভ্যাস করলেই দেখবে এর থেকে সহজ ম্যাজিক বোধ হয় দুনিয়ায় নেই। এর জন্য চাই ফুট তিনেক লম্বা একটা দড়ি, একটা কাঁচি আর একটু ভাল আঠা।

প্রথমে প্রস্তুতি হিসেবে দড়িটার এক প্রান্ত থেকে ইঞ্চি তিনেক লম্বা ছোট একটা টুকরো কেটে নাও আর সেই টুকরোটাকে দড়িটার ঠিক মাঝখানে গিঁট বাঁধো। খেয়াল করে দেখো ঐ টুকরোটা বাঁধা আছে বলে মনে হচ্ছে—যেন দুটা প্রায় সমান টুকরো দড়ি গিঁট বেঁধে আটকানো রয়েছে। ওটা যে আসলে একটা দড়ি এবং মাঝখানে যে ছোট একটা টুকরোর গিঁট রয়েছে তা কিন্তু মনেই হবে না। এবার দড়িটার দুটো প্রান্ত এক জায়গায় করে আঠা দিয়ে আটকিয়ে দাও। আঠা শুকিয়ে গেলে মনে হবে যেন একটা দড়িই সেখানে রয়েছে—আর তার দু প্রান্তে যেন গিঁট দিয়ে আটকানো রয়েছে। দড়ির আসল প্রান্ত দুটোকে মনে হচ্ছে যেন মাঝখান আর সত্যিকারের মাঝখানটাকে মনে হচ্ছে যেন দু প্রান্ত। ছবি দেখলে অথবা নিজে বানিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কী মজার। ব্যাস্ এই হল প্রস্তুতি।

এবারে দর্শকদের এই দড়ির রিংটা দেখালে সাধারণ একটা দড়ির দু প্রান্ত বলেই ভাববেন। এখন দড়ির মাঝখানটা কাটা হচ্ছে বলে ঐ আঠা লাগানো অংশটাকে কাঁচির টানে খুলে ফেললে মনে হবে দড়িটা দু টুকরো হয়ে গেল। এবার ঐ আল্গা গোড়াটাকে কেটে ফেললে—ব্যাস! সত্যিকারের ম্যাজিক। দড়িটা একদম আগের অবস্থায় ফিরে এল—কিন্তু দর্শকেরা গেলেন চমকিয়ে আর ভাবলেন ম্যাজিক করে সেটা জোড়া লেগে গেল।

একটু অভ্যাস করে খেলাটা দেখিও।

ডোডো তাতাই

লেখা | তারাপদ রায়
রেখা | কৃত্তিবাস রায়

ঘরের দেয়ালে, আলমারির গায়ে, দরজায়, জানলায় এমনকী আলনায় পর্যন্ত তাতাইবাবু লিখে রেখেছেন, 'এয়ার-গান কিনতে হবে।' এটা হল বাবার বিরুদ্ধে তাতাই-বাবুর আন্দোলন। ছবি এঁকে তাতাইবাবু একশো টাকা প্রাইজ পেয়েছেন, সেই টাকা দিয়ে তাতাইবাবুর ইচ্ছে এয়ার-গান কেনেন, এ তাঁর অনেকদিনের সাধ। এতকাল কেউ কিনে দেয়নি, কিন্তু এখন তাঁর নিজের টাকা হয়েছে, তাও কেন সে-টাকাটা নিজের ইচ্ছামত খরচ করতে পারবেন না? টাকাটা এখন বাবার মুঠোর মধ্যে চলে গেছে, বাবার কথা হল 'যাই কেনো, এয়ার-গান নয়। কার গায়ে গুলি লাগবে, কিসে কী হবে, এয়ার-গান কেনা চলবে না।'

কিন্তু তাতাইবাবুর আন্দোলন ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করল। মায়ের ছাতার উপরে প্যাস্টেল দিয়ে লিখে রাখলেন, 'এয়ার-গান কিনতে হবে।' রাস্তায় সেই ছাতা খুলে, কী কেলেঙ্কারি। মায়ের তো খেয়াল নেই। বাসায় এসে ছাতা বন্ধ করার সময় বুঝতে পারলেন কেন রাস্তার লোকেরা তাঁর ছাতায় এত উঁকি দিয়েছে। এদিকে বাবা যে সমস্ত চিঠি পোস্ট করতে দেন তার প্রত্যেকটার ঠিকানার পাশে স্লোগান, 'এয়ার-গান কিনতে হবে।' অন্যেরা যারা এই সব চিঠি পেয়েছিল, তারা কী ভাবল বা বুঝল কে জানে, কিন্তু একটা স্লোগানওলা চিঠি তাতাইবাবুর ঠাকুর্দার কাছে যেতেই তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে তাঁর নাতির এই আন্দোলনের ব্যাপারটা, এবং পত্রপাঠ তাতাইবাবুর হাতে এসে পৌঁছল একটি কুচকুচে নতুন এয়ার-গান।

এয়ার-গান আসা মাত্র তাতাইবাবু দৌড়ে ডোডো-বাবুদের বাড়িতে গিয়ে বন্দুক তুলে ডোডোবাবুকে বললেন, 'লেগস্ আপ, সামনের দুটো পা মাথার উপরে তুলুন।' তাতাইবাবু কোথায় পড়েছিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বীকে এইভাবে সম্ভাষণ করলে সে হতভম্ব হয়ে যায়। ঠিক তাই হল, ডোডোবাবু হতভম্ব হয়ে হাত দুটো মাথার উপরে তুলে দিলেন।

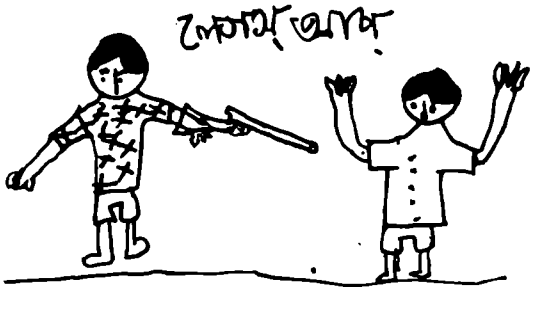

ধাঁধা আর ধাঁধা

জবা হল আমার বড় পিসীর বড় মেয়ে। মেজ পিসীর মেজ মেয়ের নাম জয়ন্তী। ছোট পিসীর দুই ছেলের পর এক মেয়ে, মেয়েটিই সকলের ছোট, তার নাম জুঁই।

জবা, জয়ন্তী আর জুঁই প্রায় সমান বয়সী। দু-এক বছরের ছোট বড় হতে পারে। গলায় গলায় ভাব তিনজনের। এক সঙ্গেই বি-এ পাশ করেছে তিন বন্ধু।

আরও মজার কথা, এই অল্পানে তিনজনেরই বিয়ের সব ঠিকঠাক। তিনটি দারুণ পাত্র। একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনিয়ার, আরেকটি উকিল।

তিনখানা হলুদ-লাগানো খাম এক-সঙ্গে বাড়িতে এসেছে। খামের গা থেকেই কেমন লুচি-লুচি গন্ধ। খাম তিনখানা যে কতবার খুলছি আর দেখছি তার ইয়ত্তা নেই।

চিলে কোঠার ঘরে ছোটকার কাছে ধাঁধা চাইতে গেছি, হাতে তখনো খাম তিনটে রয়েছে। ছোটকা আমার হাত থেকে নিয়ে খাম তিনখানা খুলে বিয়ের চিঠিগুলো একবার পড়ে নিল। তারপর মজার মুখ করে বলল, "ধাঁধা তো তোমার হাতেই রয়েছে সতুবাবু।"

আমি মজাটা ঠিক বুঝতে পারিনি। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছি। ছোটকা বলল, "লিখে নাও।"

আমি চটপট লিখে ফেলি।

প্রথম ধাঁধা ॥ পূর্ণেন্দু হল উকিল। জয়ন্তীর বিয়ে ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে হচ্ছে না। ডাক্তারের ভাবী স্ত্রীর নাম জুঁই নয়। মহেন্দ্রর সঙ্গে জবার বিয়ে। অর্ধেন্দু ইঞ্জিনিয়ার।

কার সঙ্গে কার বিয়ে?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ তিন সপ্তাহ আগে একটা বিশ্রী খুন হয়ে গিয়েছে। পাঁচ জন লোক একটা চায়ের দোকানে বসে কী-এক বিষয় নিয়ে দারুণ তর্ক জুড়ে দেয়। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় একজন আরেকজনকে খুন করে বসে। কিছু তথ্য দেওয়া হল। সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে বলতে হবে, কে খুনী আর কাকে খুন করা হয়েছে।

দিলীপকে কাল সকালে ঘণ্টাখানেক ধরে একজন লোকের সঙ্গে ব্যাডমিনটন খেলতে দেখা গিয়েছে। অন্য লোকটি নিরপরাধ।

খুনী আলোকের ভাই, তারা একসঙ্গে বড় হয়েছে।

ইন্দ্রনাথ স্ট্যাম্প জমাত।

চঞ্চল এখন ভালো ব্যাডমিন্টন খেলে, কিন্তু আগে ছিল খুব নামকরা ক্যারাম-চ্যাম্পিয়ান।

দিন দশেক আগে খুনীর পেটে একটা বড়ো অপারেশন হয়েছে।

বিমলের সঙ্গে আলোকের আলাপ মাত্র চার সপ্তাহ আগে।

আলোক খুনের দিন থেকে বাড়ির বার হয়নি বললেই চলে। দিলীপ খুব ভালো বাঁশি বাজায়। বিমল ও চঞ্চল এখনো মাঝেমাঝে একসঙ্গে তাস খেলে।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ যদি ৬টি ছেলে ৬ সপ্তাহে ৬টি খাতা লিখে ফেলে এবং ৪টি মেয়ে ৪টি খাতা লেখে ৪ সপ্তাহে, তাহলে ১২টি ছেলে ১২টি মেয়ের একটি ক্লাসে ১২ সপ্তাহে কটি খাতা লেখা হয়ে যাবে?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ নীচের সিরিজটা বেশ গোলমেলে। তবু পঞ্চম সংখ্যাটি কত হবে বুদ্ধি খাটিয়ে বের কর তো।

৭৭, ৪৯, ৩৬, ১৮...

গতবারের উত্তর ॥ (১) বিজন বিশীর মেয়ে হতে পারত, মনীষা, অসীমা অথবা যূথিকা। মনীষার বাবা যেহেতু বিজন বিশীর মেয়েকে বই দিয়েছেন, মনীষা বিজনবাবুর মেয়ে হতে পারে না। অসীমাকে বই দিয়েছে ললিতবাবু, কল্যাণীর বাবা। সুতরাং অসীমাও বিজন বিশীর মেয়ে নয়। যূথিকাই বিজনবাবুর মেয়ে ও মনীষার বাবা গৌরাঙ্গবাবু। অসীমার বাবা, তাহলে, শতদল বকসী।

(২) দীপক হয় কলকাতার, নয় যাদবপুরের ছাত্র। সে যেহেতু বর্ধমানে নেই, সে অঙ্ক নিয়ে পড়ে না। আর অর্থ-নীতির ছাত্রও নয়—বলা আছে। তার বিষয়, সুতরাং, ইতিহাস, এবং সে তাহলে যাদবপুরে পড়ে। বড়ো ছেলে যতীন কলকাতায় পড়ে না, দেখা গেল যাদব-পুরের ছাত্র দীপক, সুতরাং যতীন বর্ধ-মানে অঙ্ক নিয়ে পড়ে। তরুণ তাহলে আছে কলকাতায় এবং তার বিষয় অর্থ-নীতি। (৩) ৭৬টি সিকি ও ২৪টি আধুলি। (৪)

৯+৮+৭+৬+৫+৪+৩+২+১=৪৫

(-) ১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯=৪৫

৮+৬+৪+১+৯+৭+৫+৩+২=৪৫

(অন্য উত্তরও হয়)

সত্যসন্ধ

আচ্ছা বলো তো!

প্রঃ পাকিস্তান থেকে ট্রেনে করে দিল্লি পৌঁছেছে ইসমাইল খাঁ। তাকে জিগেস করা হল তোমার বাড়ি কোথায়? সে খুব অবাক হয়ে বলল জানো দেখছি। তার মানে কী?

উঃ তার মানে তার বাড়ি ডেরাইসমাইল খাঁ।

প্রঃ কোন্ নদী থেকে চাঁদ পালিয়ে গেছে?

উঃ চন্দ্রভাগা।

প্রঃ কালকের পরের দিন কে রাম হবেন?

উঃ পরশুরাম।

প্রঃ কোন্ রাজা রাজ্যকে ধরে আছেন?

উঃ ধৃতরাষ্ট্র।

প্রঃ কৌরবদের কোন্ ভাই ধমক-ধামককে মোটেই কেয়ার করত না?

উঃ দুঃশাসন।

প্রঃ কোন দেশে গেলে শাক-সবজিকে খাতির করে কথা বলতে হয়?

উঃ শ্রীলংকা।

প্রঃ কোন দেব বৃত্তের মধ্যে ঢুকে গেছেন!

উঃ ব্যাসদেব।

প্রঃ কোণ কখন শঙ্কু হয়?

উঃ আইসক্রীম কোন হলে।

প্রঃ কোন্ নদী থেকে একটা আকার ও একার বাদ দিলে খোঁপা হয়ে যায়?

উঃ কাবেরী।

প্রঃ মনে করে নাও পৃথিবী থেকে অন্য গ্রহে যাওয়া আসা আরম্ভ হয়েছে। কোন্ গ্রহে গেলে সকলের পক্ষেই ভাল হবে?

উঃ মংগল।

ভানুমতী

গাব্‌লু

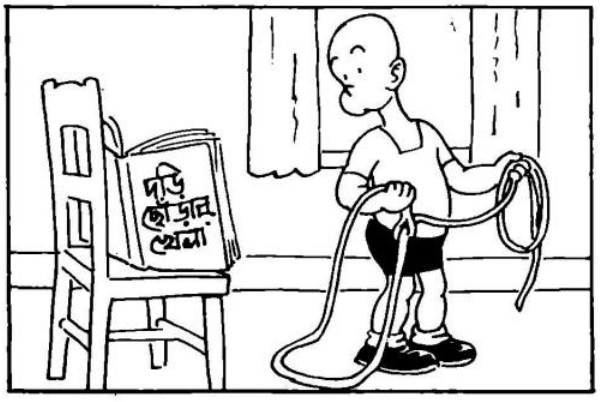

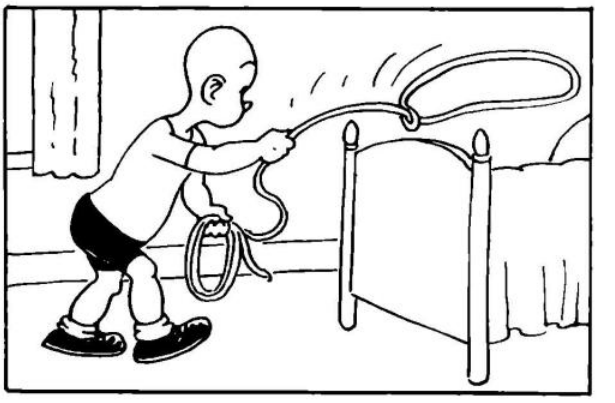

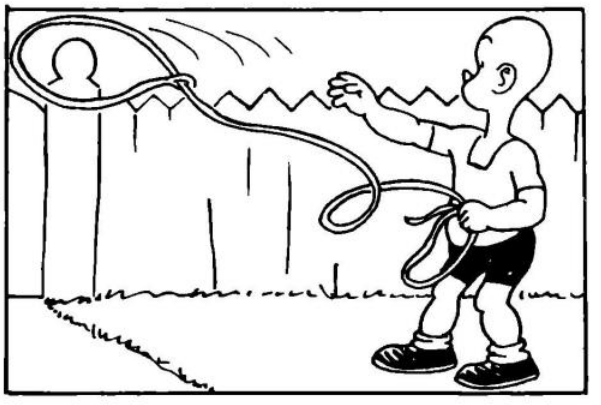

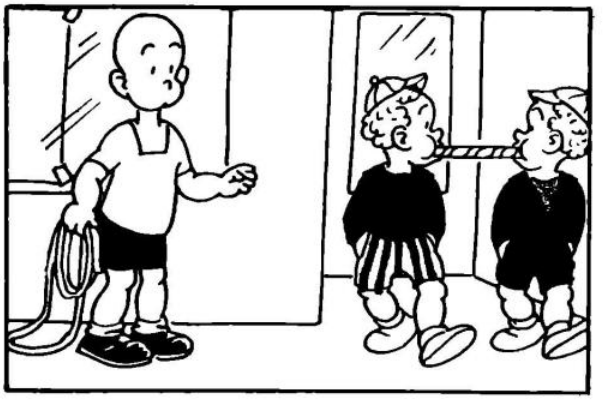

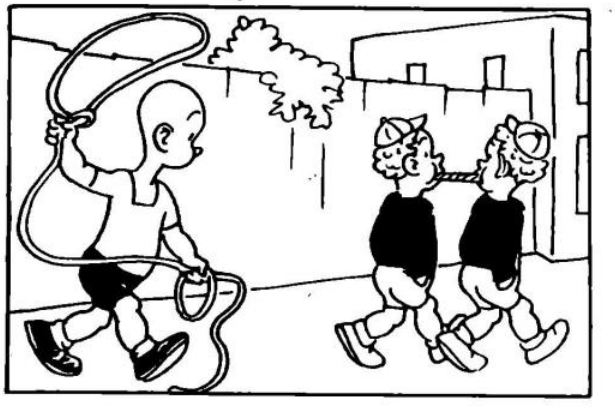

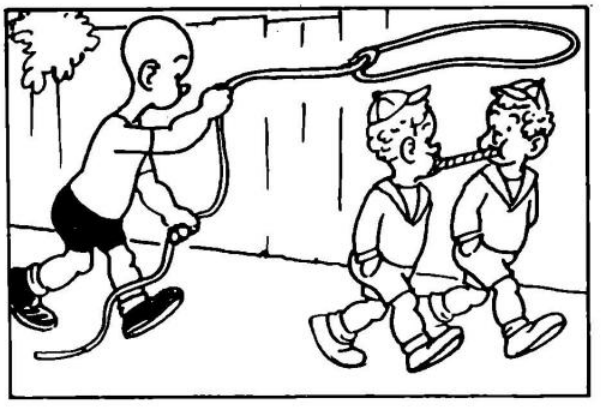

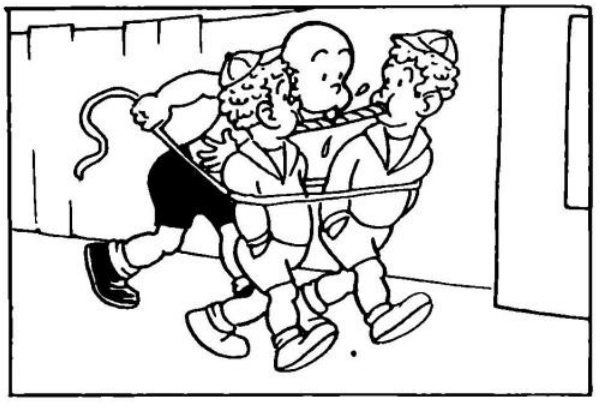

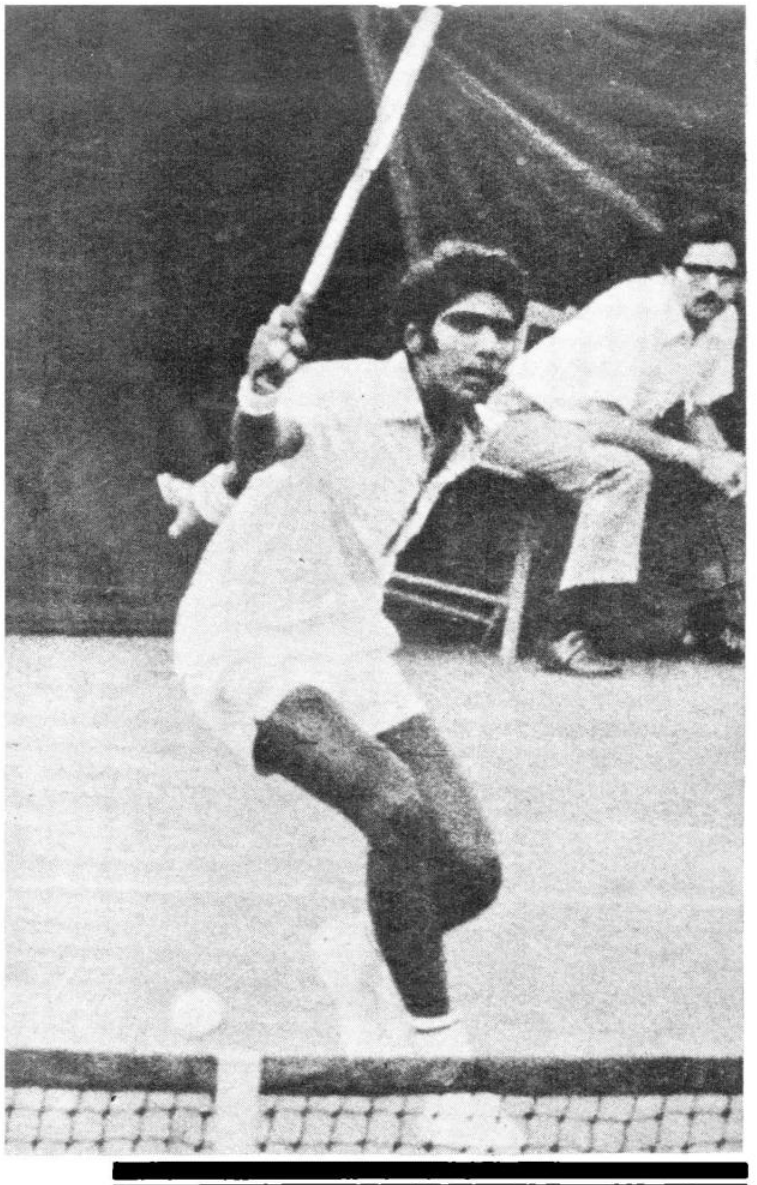

←ছবি তুলেছেন মনোজিৎ চন্দ

বিজয়ের কী হল?

সুব্রত সরকার

বিজয় অমৃতরাজ। দু-তিন বছর আগে এই নামটি আমাদের মনে অনেক আশা, অনেক রঙিন স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছিল। ক্রিকেটে ভারত তখন সবেমাত্র ইংলণ্ডের কাছে অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে হেরেছে, আর হকিতে বিশ্বকাপ তখনও জয় করে আনা হয়নি। সেই মুহূর্তে ওই আবলুস কাঠের মত কালো, ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা যুবক বিজয়কে ভারতীয় ক্রীড়াজগতের ভবিষ্যৎ নায়ক বলে মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল শীঘ্রই এই তরুণ খেলোয়াড়টি বিশ্ব টেনিস মহলে এক আলোড়ন সৃষ্টি করবে, আমাদের ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করবে।

আমাদের সেই আশা পূর্ণ হয়নি। আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৪ তারিখে বিজয়ের ২৩ বছর পূর্ণ হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই মাদ্রাজী খৃষ্টান তরুণ আন্তর্জাতিক টেনিসের কোন বড় খেতাব লাভে সফল হয়নি। অবশ্য মাঝে-মাঝে সে কিছু-কিছু বড় খেলায় সফল হয়েছে। যেমন, গত নভেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় গ্রাঁ প্রী টুর্নামেণ্টের মতন প্রতিযোগিতায় সে জিতেছে। কিন্তু জিমি কনর্স অথবা বুয়র্ন বর্গের (তিন বছর আগে যাদের বিজয়ের সমতুল্য মনে করা হত) মত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেনি।

এই বছর মার্চ মাসে বিজয় আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ টেনিস (ডাবলু-সি-টি) প্রতিযোগিতায় প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন স্ট্যান স্মিথকে ফাইনালে হারিয়ে একটি টুর্নামেণ্ট জয়লাভ করে, আর সেপ্টেম্বরে নিউপোর্টে আরেকটি ছোট টুর্নামেণ্ট জেতে। তবে দুঃখের বিষয়, সবথেকে মর্যাদাপূর্ণ উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপে আর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র ওপেন প্রতিযোগিতার একটাতেও সে দ্বিতীয় রাউণ্ডের বেশী এগোতে পারেনি।

গত মাসখানেক বিজয় কোন টুর্নামেণ্টেই খেলছে না। দাদা আনন্দ্ আর ছোট ভাই অশোকের সঙ্গে বিজয় এখন হলিউড্—নামকরা নিগ্রো অভিনেতা সিড্নি পোয়াতিয়রের সঙ্গে একটি সিনেমায় অংশগ্রহণ করবে বলে! বিজয়কে আবার পেশাদারী টেনিস জগতে ফিরে পাওয়া যাবে ২২শে নভেম্বর, বাঙ্গালোরে—এই বছরের ভারতীয় গ্রাঁ প্রী টুর্নামেণ্টের খেলায়।

অবশ্য একদিক থেকে বিজয় যে টেনিস খেলায় এতদূর এগিয়েছে সেটাই এক আশ্চর্য ঘটনা। ছেলেবেলা থেকেই সে হাঁপানিতে ভোগে। এখনও সে সী-লেভেল থেকে বেশি উঁচু কোন শহরে খেলতে চায় না, কারণ সেখানে তার শ্বাসকষ্ট হয়। গত বছরের নেতাজী স্টেডিয়ামে গ্রাঁ প্রী প্রতিযোগিতার ঠিক আগেই সপ্তাহ দুই ধরে সে অসুস্থ ছিল—তার জয়লাভ কেবল তার খেলার ক্ষমতা প্রমাণ করেনি, প্রকাশ করেছে তার সাহস।

ওই টুর্নামেণ্টে বিজয় অরেকটু হলে তার প্রথম খেলাতেই অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতের খেলোয়াড় রে রাফেল্সের কাছে হেরে যাচ্ছিল। কোনক্রমে জেতবার পর সে বলেছিল, "কলকাতা বলেই পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পেলাম! এখানকার দর্শকরা কিছুতেই আমাকে হারতে দেবে না।" কলকাতা বরাবরই বিজয়ের কাছে খেলার পক্ষে খুব প্রিয় জায়গা, বিশেষ করে সাউথ ক্লাবের ঘাসের কোর্টগুলি।

নেতাজী স্টেডিয়ামে আমরা বিজয়ের প্রথম সার্ভিসের জোর ও সমতা লক্ষ করেছি। এখন বিজয়ের খেলার এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই যখন ও সার্ভ ভাল করতে পারে না, ওর সমস্ত খেলাটাই পড়ে যায়। তবে সেটাই তার অসাফল্যের একমাত্র কারণ নয়।

যদিও বিজয় পৃথিবীর প্রায় সব খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের হারিয়েছে, তবু তার খেলার রেকর্ড খুব একটা মেকদার নয়। কারণ ও প্রায়ই ছোটখাট খেলোয়াড়দের কাছে হেরে যায়। সব মিলিয়ে ওর উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তিনটি কারণ—এক, সে যথেষ্ট পরিশ্রম করেনি খেলার জন্য ; দুই, সে স্বভাবত খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়, বরং মেজাজে ঢিলে-ঢালা ; আর সব শেষে, ও বেশির ভাগ সময়ই নিজের ভাইয়েদের সঙ্গে অনুশীলন করে, যাদের খেলার মান ওর নিজের থেকে নিচু হওয়াতে বিজয়ের নিজস্ব দুর্বলতাগুলো দূর করতে খুব একটা সাহায্য করতে পারে না।

এখন বিজয় বছরে সত্তর হাজার ডলার (অর্থাৎ সোয়া ছ'লাখ টাকার মত) উপার্জন করে টেনিস খেলে, কিন্তু এদেশে বিজয়ের অনুরাগীদের কাছে সেটা বড় কথা নয়। আশা করা যায়, এবছরে বাঙ্গালোরে গ্রাঁ প্রী টুর্নামেণ্ট আর দেশে-বিদেশে ভারতবর্ষের ডেভিস কাপ খেলা থেকে আরম্ভ করে বিজয় সামনের বছরের মধ্যে বিশ্ব টেনিসের সত্যিই এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

সারা মাঠে হাসি

পুষ্পেন সরকার

ফাইনাল-খেলার একটি দৃশ্য

দুর্গাপুজোর আনন্দ এবার ফুটবল-সমর্থকরা খুব ভাল করেই উপভোগ করেছেন। পরাজয়ের ব্যথা নেই কারও মনে। সকলের মুখেই হাসি। ১৯৭৬ সালের আই এফ এ শীলড দুহাতে আনন্দ উজাড় করে ঢেলে দিয়ে বিদায় নিয়েছে।

গত ২৫ সেপটেমবর আই এফ এ শীলড ফাইনালের নির্দিষ্ট ৯০ মিনিট সময়ের মধ্যে মোহনবাগান ও ইসটবেঙ্গল কোন গোল করতে পারেনি। আই এফ এ-র আইন অনুযায়ী খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দুদলকে যুগ্ম-জয়ী ঘোষণা করা হয়। খেলা শেষ হবার পর এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে। সারা মাঠে হাসি। সকলের মুখে হাসি। দু দলের খেলোয়াড়রা একে অপরকে করছে আলিঙ্গন। পিঠ চাপড়ে বাহবা দিচ্ছে ভাল খেলার জন্য। তারপর একসঙ্গে হাতে হাত ধরে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসেন ওরা।

জয়ে আনন্দ আছে। যারা জয়ী হয় তাদের খেলোয়াড়, সদস্য ও সমর্থকেরা সব দেশেই আনন্দ করে থাকে। কিন্তু যখন দেখা যায় সেই জয়ের আনন্দ পরাজিত দলকে ইচ্ছাকৃত-ভাবে ব্যথা দিচ্ছে তখন অশান্তির সৃষ্টি হয়। আনন্দের পরিবর্তে অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। একটা কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে। খেলাধুলার প্রধান উদ্দেশ্যগুলির একটি হল বন্ধুত্বের সৃষ্টি। প্রীতির সম্পর্ক দৃঢ় করা।

এবারের শীলডে বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে কোনরূপ তিক্ততা সৃষ্টি হয়নি সমর্থকদের মধ্যেও। কেউ অপরকে ছোট ভাবতে পারেনি সাফল্যের জন্য। একটা ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারছি না। আমাদের পাড়ায় টুকাই ও বাবলু দুজনেই ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। দারুণ বন্ধুত্ব দুজনের মধ্যে। কিন্তু মোহন-বাগান-ইসটবেঙ্গল খেলা পড়লে সকাল থেকে দুজনের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়, টুকাই মোহনবাগান আর বাবলু ইসটবেঙ্গলকে ভালবাসে।

শীলড ফাইনালের দিনে বাবলুর জন্মদিন পড়েছিল। বাবলু নিমন্ত্রণ করেনি টুকাইকে। ব্যাপারটি বাড়ির কেউ জানত না। রেডিওতে খেলা শেষ হবার বিবরণ শোনার পর বাবলু ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে, ওর মা বললেন, "বাবলু, তোমার বন্ধু-বান্ধব সব এসে পড়বে, তুমি কোথায় যাচ্ছ?" "এখুনি আসছি" বলে বাবলু দৌড়ে বেরিয়ে যায়। টুকাইদের বাড়ি পৌঁছে ও টুকাইকে জড়িয়ে ধরে বলে, "আমার জন্মদিন আজ। তাড়াতাড়ি চল।" টুকাই কেমন ঘাবড়ে যায়। আস্তে আস্তে বলে, "তুই তো আমাকে কিছু বলিস নি। আমি বাবা, মা কাউকে কিছু বলিনি। এখন কী করে যাই।" তাই না শুনে বাবলুর চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করল।

হঠাৎ টুকাইয়ের মনে পড়ে যায়, গতকাল অফিস থেকে ফেরার সময় বাবা একটা নতুন কলম ওর জন্য কিনে এনেছেন। বাবলুকে বলে, "তুই দাঁড়া, আমি যাব তোর সঙ্গে।" ছুটে ঘরে ঢুকে যায়। মায়ের কাছে গিয়ে বলে সব কথা। মা হাসিমুখে সম্মতি দেন। কলমটা বাবলুর পকেটে গুঁজে দিয়ে দুজনে গলাগলি হয়ে বেরিয়ে পড়ে বাবলুদের বাড়ির পথে। বাবলুদের বাড়ির সন্ধ্যা বন্ধুদের আনন্দে-হাসিতে, খাওয়া-দাওয়ায় ঝলমলিয়ে ওঠে।

আই এফ এ শীলড ফাইনালে ইসটবেঙ্গল ও মোহনবাগানের দেখা হওয়া এই প্রথম নয়। এবার নিয়ে মোট পনেরোবার তারা মুখোমুখি হয়েছে। ইসটবেঙ্গল জিতেছে ৮ বার, মোহনবাগান

ফাইনাল-খেলার আরও দুটি দৃশ্য / ছবিঃ মনোজিৎ চন্দ

দুবার। ১৯৬১ ও ১৯৭৬ দুবার যুগ্মজয়ের সম্মান। ১৯৫৯, ১৯৬৪ ও ১৯৬৭ এই তিন বছর দুদলের ফাইনালের নিষ্পত্তি হয়নি। ইসটবেঙ্গলের মোট শীলড জয় হল পনেরো-বার। মোহনবাগানের দশ বার। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পরপর পাঁচ বছর টানা শীলড জিতে ইসটবেঙ্গল গড়ল এক অনন্য রেকরড। ১৯৬৯ সালে লীগ ও শীলড জিতে যে 'ডাবলসের' সম্মান পেয়েছিল, দীর্ঘ ৬ বছর পর সেই গৌরব আবার ফিরে পেল মোহনবাগান। ইসটবেঙ্গল ফাইনালে উঠেছিল কোয়ারটার ফাইনালে বেহালা ইউথকে ৫—২ গোলে এবং সেমিফাইনালে গোয়া একাদশকে ২—০ গোলে হারিয়ে। মোহনবাগান হায়দরা-বাদের সিটি কলেজ ওলড বয়েজকে ৩—১ গোলে এবং জরজ টেলিগ্রাফকে ২—০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে গিয়েছিল।

এবারের আই এফ এ শীলডের প্রাথমিক রাউনডের খেলা-গুলি চারটি ভাগে ভাগ করে খেলান হয়েছে। কলকাতায় 'এ' গ্রুপ, বার্নপুরে 'বি' গ্রুপ, কৃষ্ণনগরে 'সি' গ্রুপ এবং খড়্গপুরে 'ডি' গ্রুপের খেলাগুলির ব্যবস্থা করেন আই এফ এ। কলকাতার বাইরের লোকেরাও যাতে শীলড খেলা দেখতে পায় এবং খেলার জনপ্রিয়তা ও মান বাড়ে সেই কারণেই এই ব্যবস্থা। 'এ' গ্রুপ থেকে বেহালা ইউথ, 'বি' গ্রুপ থেকে জরজ টেলিগ্রাফ, 'সি' গ্রুপ থেকে এরিয়ান এবং 'ডি' গ্রুপ থেকে বি এন আর মূল প্রতি-যোগিতায় ওঠে।

শীলডে বাইরের কোন শক্তিশালী দল এবার আসেনি। যারা এসেছিল তাদের মধ্যে গোয়া একাদশের কিছুটা নাম করা যেতে পারে। ফুটবলে গোয়ার নাম আছে। কিন্তু যে দলটি এসেছিল সেটি গোয়ার প্রথম দল নয়। অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গড়া গোয়া দল তাই কলকাতার ফুটবল রসিকদের মনে তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি।

এবারের খেলায় সব থেকে বেশি সুনাম পেয়েছে দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লীগে তৃতীয় স্থানাধিকারী বেহালা ইউথ। ২৪ পরগনা জেলা, বিশাখাপত্তনম জেলা এবং প্রথম ডিভিশনের ইসটারন রেলকে হারিয়ে তারা মূল প্রতিযোগিতায় ওঠে। মূল প্রতিযোগিতায় কামপটির রব্বানী ক্লাবকে টাইব্রেকারে ৫—৪ গোলে হারিয়ে কোয়ারটার ফাইনালে শক্তিশালী ইসটবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলার অধিকার অর্জন করে। কোয়ারটার ফাইনালে ইসটবেঙ্গলকে যথেষ্ট বেগ দিয়ে এবং দুবার দুবার গোল করে এগিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ৫—২ গোলে হার স্বীকার করে বেহালা ইউথ। দলে কোন নামকরা খেলোয়াড় নেই। বয়সে সকলেই তরুণ। কিন্তু নিজেদের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া আর উন্নত ফুটবলের ছলাকলা দেখিয়ে বেহালা ইউথ সকলের প্রশংসা পেয়েছে। জরজ টেলিগ্রাফও ভাল খেলেছে। তবে সেমি-ফাইনালে তারা মোহনবাগানকে যেমন বেগ দেবে আশা করা গিয়েছিল তেমন দিতে পারেনি।

আই এফ এ শীলডের সমালোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে খেলা তেমন জমেনি। মহমেডান স্পোরটিং নাম তুলে নেওয়ায় খেলার আকর্ষণ কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ে। বাইরের দল-গুলির খেলা দেখে সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত কলকাতার শক্তিশালী দল দুটির মধ্যেই শীলডের লড়াই হবে। হলও তাই। এবং অনেক নামকরা খেলোয়াড় নিয়ে গড়া শক্তিশালী ইসটবেঙ্গল ও মোহনবাগান আর-পাঁচটা সাধারণ দলের মত খেলে ১৯৭৬ সালের আই এফ এ শীলডে মান রাখার মত কোন স্মৃতি রেখে যেতে পারল না। ৯০ মিনিটের মধ্যে দর্শকেরা কোন গোলে একটি শট দেখতে পায়নি, এ-আক্ষেপ বহুদিন তাদের মনে থাকবে। ফরোয়ার্ডরা রক্ষণভাগকে বিব্রত বা উদ্বিগ্ন করতে পারছে না, এখনকার ভারতীয় ফুটবলে এইটাই সব থেকে বড় ত্রুটি।

এবারের শীলড ফাইনালে একমাত্র আনন্দের কথা যে তরুণরা আশা জাগিয়েছে। এ-জাতীয় বড় খেলায় খেলোয়াড়দের স্নায়ুর উপর ভীষণ চাপ পড়ে। বিশেষ করে যারা তরুণ তারা নিজেদের স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারে না। কিন্তু এবারে দেখা গেল অন্য চিত্র। দু দলের তরুণ খেলোয়াড়রাই যেটুকু খেলা খেলল। হাবিব, সুভাষ, সুরজিত আকবর প্রমুখদের যখন মাঠে খুঁজে নিতে হচ্ছিল তখন দিলীপ পালিত, চিন্ময় চ্যাটারজি, আহত শ্যামল ব্যানারজি, প্রসুন ব্যানারজি এবং দিলীপ সরকারকে মাঠে অন্য অনেকের থেকে বড় মনে হয়েছে। নবীনের এই এগিয়ে যাওয়া আশার কথা। প্রবীণদের মধ্যে মাঠে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন সুধীর কর্মকার। অনভ্যস্ত স্টপারের দায়িত্ব সেদিন নির্ভীকভাবে পালন করে সুধীর দেখিয়ে দিলেন আজও তিনি একজন জাত-খেলোয়াড়।

বিশেনসিং বেদী

ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের বোঝাপড়া

বজ্রসেন

বাদলধারার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার ফুটবলও সারা হল। আর ফুটবল-বিদায়ের সুরের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ক্রিকেটের আগমনী বাজছে। বোধ হয় ঠিক সেইজন্যেই গত ২৫ সেপ্টেম্বর, যেদিন বিকেলে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাজার চল্লিশেক লোক মোহনবাগান মাঠে আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে শুধু একটি গোলের জন্যে হা-হুতাশ করছিল—ঠিক সেই দিনেই দুমাসের পাকিস্তান ও ভারত সফরের উদ্দেশে সাগর পাড়ি দিয়েছিল নিউজিল্যাণ্ডের ক্রিকেট দল। অধিনায়ক গ্লেন টারনার। মাসিক আনন্দমেলার এই সংখ্যা বেরুবার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্টের সম্ভাব্য ফল নিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। অবশ্য কলকাতার দর্শকরা বিরস মুখে বলতেই পারে, "বেল পাকলে কাকের কী? কলকাতায় তো আর নিউজিল্যাণ্ডের টেস্ট হচ্ছে না!" তা অভিমানেরই কথা বটে।

যাক সে কথা। নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে যে আমাদের অনেক বোঝাপড়া বাকি! তা, সে কলকাতায় টেস্ট হোক আর না-ই হোক। ফেব্রুয়ারিতে ওয়েলিংটনে তৃতীয় টেস্টে আমরা নিউজিল্যাণ্ডের কাছে শোচনীয়ভাবে হেরেছি ইনিংসে ও ৩৩ রানে। সে-কাঁটা এখনও বুকে বিঁধে আছে। হারের পর হার। ঐ নিউজিল্যাণ্ড সফরেই একদিনের আন্তর্জাতিক খেলা দুটিতেই ভারত হেরেছে। অবশ্য এর আগেই গত বছরের জুনে নিউজিল্যাণ্ড একদিনের ক্রিকেটে তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছিল ওল্ড ট্র্যাফোরডে ভারতকে চার উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা থেকে ভারতের বিদায় ঘটিয়ে। কত আর বলা যায়? ওদের মেয়েরাও তো এই ফেব্রুয়ারিতেই পাঁচ টেস্টের সিরিজের শেষটি জিতে বিজয়িনীর সম্মান নিয়ে দেশে ফিরে গেছে!

"হ্যাঁ, বোঝাপড়া করতে হবে আমাদেরও"—মনে মনে নিশ্চয়ই এ-কথা বলছেন টারনার এবং তাঁর সতীর্থরা। কারণ গত সিরিজে ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় টেস্টে ভাগ্য তথা আবহাওয়া ভারতের পক্ষে না খেললে নিউজিল্যাণ্ড তো জিতেই যাচ্ছিল। আর ঐ টেস্টে জেতা থাকলেই নিউজিল্যাণ্ড সিরিজ জিতে ভারতের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম রাবার জয়ের স্বাদ পেত। সত্তরের দশকের পাঁচটি বছরে নিউজিল্যাণ্ড দারুণ খেলেছে। এই সময়ে তারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে পাঁচ টেস্টের একটি সিরিজ ড্র করেছিল, ইংল্যাণ্ডকে দুটি টেস্টে রীতিমত বেগ দিয়েছিল আর ইয়ান চ্যাপেলের দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়ান দলকে সিডনীতে অর্ধমৃত করার পর ক্রাইস্টচার্চে সম্পূর্ণ ঘায়েল করেছিল।

বর্তমান সিরিজটি ব্যক্তিগতভাবে টারনারের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। বিদেশে টেস্ট সিরিজে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তিনি এই প্রথম পেয়েছেন।

ভারতের সঙ্গে কিউই পাখির দেশের এই সিরিজটিতে ব্যাট-বলের লড়াই যে দারুণ জমে উঠবে সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। বোম্বাইয়ের টেস্ট (যেটি হবে দু' দেশের মধ্যে বিংশতিতম) ছাড়া আর দুটি টেস্ট হবে কানপুরে ও মাদ্রাজে। আগের টেস্টগুলিতে ভারতের জয় আটবার আর নিউজিল্যাণ্ডের তিনবার। আর একটা কথাও একরকম জোর করেই বলা যায়, আগের সিরিজের মত চলতি সিরিজেও লড়াই হবে ভারতীয় স্পিনের সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ডের পেসের। আমাদের যেমন একজনও যথার্থ পেস বোলার নেই এবং আমাদের ব্যাটসম্যানরা পেস খেলতে সাধারণত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, ঠিক তেমনি নিউজিল্যাণ্ড দলে নামী স্পিনার একজনও নেই। মার্ক বার্জেসকে বাদ দিলে দলে স্পিন বোলিংয়ের মোকাবিলা করার মত বিশেষ কেউ নেই, এমন কি বিশ্ববিখ্যাত টারনারও না।

অবশ্য একটা কথা মনে রাখা দরকার। পূর্ণ শক্তি নিয়ে নিউজিল্যাণ্ড পাক-ভারত সফরে আসতে পারেনি। টারনারের সমগোত্রীয় খ্যাতনামা ব্যাটসম্যান বিভান কংডন এবং ল্যাটা স্পিনার হেডলি হাওয়ার্থকে গোড়া থেকেই দলে পাওয়া যায়নি। ব্রায়ান হেসটিংস অবসর নিয়েছেন। যে-দল প্রথমে ঘোষিত হয়েছিল তার মধ্যে আবার কুশলী উইকেট-রক্ষক-ব্যাটসম্যান ওয়ার্ডসওয়ার্থ ক্যান্সারে মারা যান। এই

খেলোয়াড়টির মৃত্যু দলকে শুধু হীনবল করে দেয়নি, সতীর্থদের উপর এক বিষাদের ছায়া ফেলেছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের বদলে এসেছেন ওয়ারেন লীজ। পেসার হ্যাডলী ভাইদের এক-জন ডেইল আসেননি ব্যক্তিগত কারণে আর মিডিয়াম পেসার এবং অলরাউণ্ডার ব্রায়ান ম্যাককেচ্‌নি এলেন না আঙুলের আঘাতের জন্যে। এঁদের স্থান পূরণ করেছেন যথাক্রমে মিডিয়াম পেসার গ্যারি ট্রুপ এবং ব্যাটসম্যান-অফস্পিনার জেফ হাওয়ার্থ।

তবুও নিউজিল্যাণ্ডের যে দল এসেছে সেই দলই ভারতকে যথেষ্ট নাজেহাল করবে, একথা একরকম জোর করেই বলা যায়। পনেরজনের দলে ন'জনের অন্তর্ভুক্তি ব্যাটসম্যান হিসাবে। অন্তত পাঁচজন—টারনার, তাঁর ওপেনিং জুড়ি জন মরিসন, জন পার্কার, মার্ক বার্জেস ও জেফ হাওয়ার্থ যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন —বড় ইনিংস গড়ার ব্যাপারে নিউজিল্যাণ্ড এঁদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। এই পাঁচজনের মধ্যে গ্লেন টারনারের খ্যাতি এখন মধ্যগগনে। নিউজিল্যাণ্ডের ইতিহাসে এ পর্যন্ত তিনিই এক-মাত্র ব্যাটসম্যান যিনি এক মরসুমে সহস্র রান অতিক্রম করতে পেরেছেন। গত সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে নিউজিল্যাণ্ডের একমাত্র সেঞ্চুরিটিও তাঁর। আর বিশ্বকাপ ক্রিকেটে তিনি

জন মরিসন

জন পার্কার

গ্লেন টার্নার

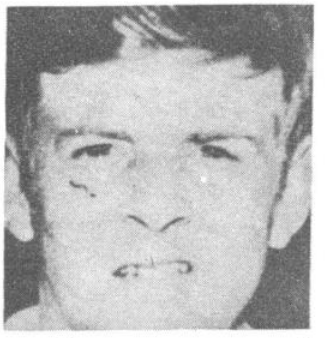

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান, অপরাজিত ১৭১ সমেত, মোট দুটি সেঞ্চুরি করেন। প্রতিযোগিতার চারটি খেলায় তিনি মোট ৩৩৩ রান করেন, ব্যাটিংয়ের গড় ১৬৬·৫। দুই 'জন', পার্কার ও মরিসন, টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন, কিন্তু এঁরা সব সময় প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন না। জেফ হাওয়ার্থ গত মরসুমে ইংল্যাণ্ডের কাউণ্টি ক্রিকেট চ্যামপিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় 'সারে'র হয়ে খেলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অ্যাণ্ডি রবারটস বোলিংয়ে যেমন নিপুণ ব্যাটিংয়ে তার অর্ধেক নৈপুণ্যও যদি নিউজিল্যাণ্ডের অ্যাণ্ডি রবার্টস-এর থাকত, তা হলে টারনার অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। আগের সিরিজে অ্যাণ্ডি রবার্টস তাঁর ব্যাটিং যোগ্যতার বিশেষ প্রমাণ দিতে পারেন নি। জন পার্কারের ভাই মারে (ইনি হলেন দু'নম্বর ওপেনিং ব্যাটসম্যান), রবার্ট এণ্ডারসন ও ওয়ারেন লীজ—এই তিনজন ব্যাটসম্যান বর্তমান সফরের আগে কোনও টেস্ট খেলেননি। দ্বিতীয়জন পাকিস্তানে এবার নিউ-জিল্যাণ্ডের প্রথম সেঞ্চুরিটি করেছেন।

বোলিংয়ে নিউজিল্যাণ্ডের পেস আক্রমণ শুরু করবে দুই রিচার্ড—কলিন্স ও হ্যাডলী। দীর্ঘদেহী ল্যাটা পেসার রিচার্ড হ্যাডলীর বলের গতি অসাধারণ বা ভয়ংকর না হলেও অনেকের থেকেই মারাত্মক। এঁকে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা কিছুটা সম্ভ্রম করে চলবেন। ওয়েলিংটনে হ্যাড্‌লীর সেই ২৩ রানে ৭, ভারতের বিরুদ্ধে তথা যে কোনও টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড বোলারের এক ইনিংসের রেকর্ড। ঐ ম্যাচের মোট ৫৮ রানের বিনিময়ে ১১ উইকেট প্রাপ্তিও অনুরূপ একটি রেকর্ড। তবুও বলতে হবে রিচার্ডের বলের লেংথ সবসময়ে সমান থাকে না, যা অপর দীর্ঘকায় পেসার বা সঠিকভাবে বলতে গেলে ফাস্ট মিডিয়াম পেসার রিচার্ড কলিন্সের থাকে। দুই রিচার্ডকে সাহায্য করবেন দুই মিডিয়াম পেসার ল্যান্স কেয়ার্নস (ইনি ইন-সুইংগার দেন) ও দলে অন্যতম নতুন মুখ গ্যারি ট্রুপ। ট্রুপ এবছরের গোড়ার দিকে ডেরিক রবিন্সের দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করে এসেছেন...স্পিন বোলিংয়ে টারনারের হাতে সবচেয়ে অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ডেভিড ও'সালিভ্যান। তাঁর সঞ্চয় পাঁচটি টেস্টে সমসংখ্যক উইকেট। এ-থেকেই বোঝা যায় নিউজিল্যাণ্ডের ভরসা কিসের ওপর। দলের অপর স্পিনাররা হলেন নবাগত পিটার পেথারিক, জেফ হাওয়ার্থ, মার্ক বার্জেস (সকলেই অফস্পিনার) এবং জন পার্কার। শেষের দুজনকে বদলী বোলার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এঁরা আবার ফিল্ডিংয়েও দলের ভরসা। টারনার নিজেও একজন নামকরা ফিল্ডার।

এ তো গেল কাগজে-কলমে টারনারের দলের শক্তির কথা। কার্যক্ষেত্রে অনেক অঘটনই ঘটবে। আর সেই অঘটন, অনিশ্চয়তাই তো ক্রিকেটের মজা।

জমজমাট মজার আসর

৫০০টি পুরস্কার জিতে নাও!

সেই সঙ্গে অতিরিক্ত বড় রকম পুরস্কারের সম্ভাবনা

যে সংখ্যাটি নেই সেটি কি ?

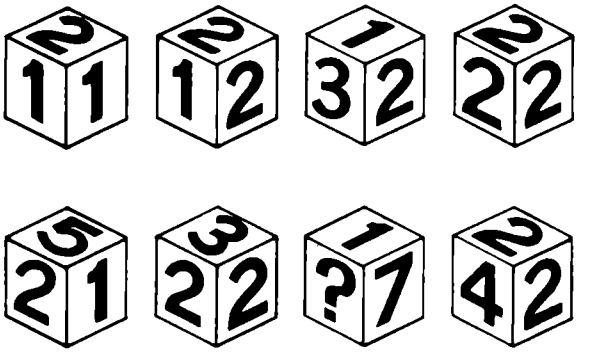

শিগ্‌গির! তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস জেমসের একটি খালি প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ৫০০ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে। আর যদি তোমার বরাত ভাল, তোমার গিফ্‌ট চেকের উপর আরো ৪০০ টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে—ভাগ্যবান বিজেতাদের অতিরিক্ত পুরস্কার।

বড় স্পষ্ট হরফে শুধু ইংরেজিতে তোমাদের উত্তর আর নাম ও ঠিকানা লিখবে। এই ঠিকানায় পাঠাও :
"Fun with Gems" Dept. 52-E
Post Box No. 56, Thane 400 601.
উত্তর পৌঁছবার শেষ তারিখ :
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৬।

রঙ বেরঙের চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস জেমস

CHAITRA-C-39 BEN

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি তুলেছেন মনোজিৎ চন্দ

তোমাদের পাতা

প্লেনের দোকান

গত মে মাসে আমি থাই ইণ্টারন্যাশনালের প্লেনে ব্যাংকক থেকে আসছি কলকাতায়। আমি একা, সঙ্গে কেউ নেই। জানলার ধারে বসে আছি। প্লেনে তিনজন এয়ার হোসটেস ছিলেন। যে-সব মহিলা প্লেনের ভেতরে যাত্রীদের দেখাশোনা করেন, খাবার দেন, তাঁদের এয়ার হোসটেস বলে। এয়ার হোসটেসরা খাবার নিয়ে এলেন। দুজন খাবার দিচ্ছেন, আর একজন গাড়িতে করে কফি, চা, সরবত ইত্যাদি দিচ্ছেন। এয়ার হোসটেসরা খাবার দিয়ে ত চলে গেলেন। আমি খাচ্ছি আর বাইরের দিকে তাকাচ্ছি।

খাওয়ার পরে দেখলাম এক ভদ্রলোক যাত্রীদের কাছে অনেক কিছু বিক্রি করছেন। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। প্লেনে আবার দোকান আছে নাকি! আমি যখন ছোটবেলায় প্লেনে চড়েছি তখন কিছুই দেখিনি। ১৯৭৪ সালে ঢাকা থেকে যশোর যাওয়ার সময় প্লেনে কিছু বিক্রি হতে দেখিনি। এবারে থাইল্যাণ্ডে যাওয়ার সময়েও প্লেনে কিছু বিক্রি হতে দেখিনি। কিন্তু আসার সময় দেখলাম, কী সব জিনিস বিক্রি হচ্ছে। অনেকে কিনছে, ডলার দিয়ে দাম দিচ্ছে।

আমি সিট ছেড়ে উঠলাম কী জিনিস বিক্রি হচ্ছে দেখতে। দেখলাম তাস, বিস্কুট, সিগারেট ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে। আমার কাছে দু'ডলার ছিল, যাওয়ার সময় দমদম থেকে চার ডলার নিয়ে গিয়েছিলাম, ব্যাংককে মাত্র ২ ডলার খরচ করেছি। অর্থাৎ এখানকার ১৯ টাকা। আমার জেঠতুতদের জন্যে দু'ডলার দিয়ে দুই প্যাকেট তাস কিনলাম। আমি কখনও নিজে এত টাকা খরচ করিনি। তাস কিনে জায়গায় ফিরে এলাম। আমার পাশে একজন অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়াট ইস দিস?" আমি উত্তর দিলাম, "দিস ইস কার্ড।" তিনি আয়ার হাত থেকে তাসের প্যাকেট দুটো নিয়ে বললেন, "ভেরি নাইস।" তিনি ইংরেজীতে বললেন, "আমি অবশ্য খেলা জানি, প্রথমে বুঝতে পারিনি।" অস্ট্রেলিয়ান সাহেবের নাম ছিল জ্যাক ওয়ালটার।

জয়নন্দন হালদার
(বয়স ১১)

পেনসিল

পেনসিল তুমি দুষ্টু বড়ই
রোজই ভাঙো মোর হাতে।
লিখতে দাও না একটু সময়
ইসকুলে গেলে মারটি খাওয়াও
আমায় দেখ না চেয়ে।

ব্রহ্মবিকাশ রায়চৌধুরী
(বয়স ৬)

বাবা

বাবা খান পান
অফিসেতে যান
তিন কোটি টাকা তিনি
করেছেন দান।

—নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য (বয়স-৯)

বিজয়া

বিজয়ার প্রতিমার ঠোঁটে নেইকো আজ হাসি,
দুর্গা যাচ্ছেন শ্বশুরবাড়ি, বাজছে ঢোলক কাঁসি।
অন্ধকার বাপের বাড়িতে একটি প্রদীপের আলো।
ছড়িয়ে প'ড়ে অন্ধকারকে রাখে না গো কালো।
দুর্গা আর তাঁর পুত্রকন্যা তাঁদের বাহন চড়ে,
পরের বছর ফিরে আসবেন নতুন পোশাক পরে।

সন্দীপ রায়চৌধুরী
(বয়স ১০)

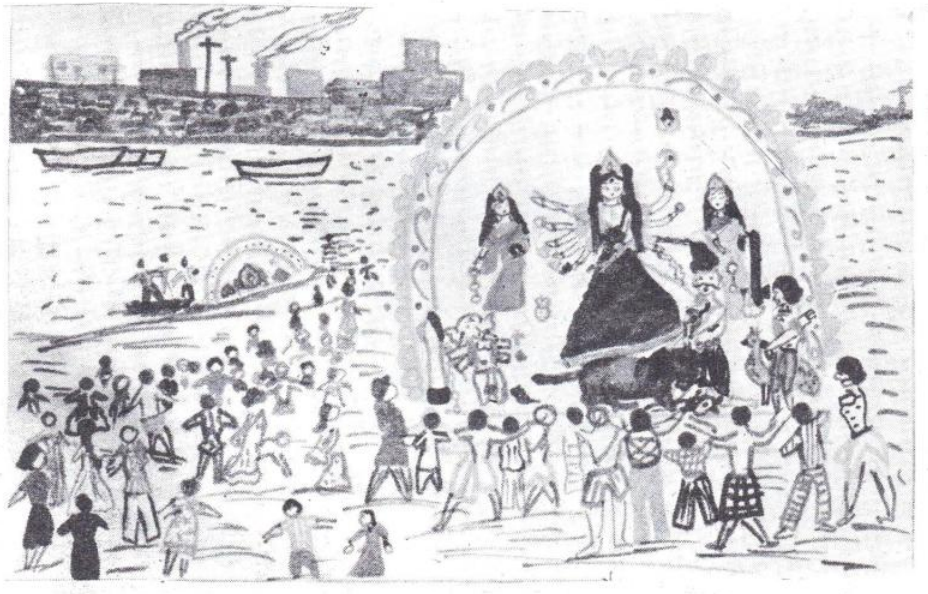

ছবি এঁকেছে সন্দীপ রায়চৌধুরী

বাধ্য ছেলে

একটি ছেলে দুষ্টুমি করার জন্য তার মা কাছে খুব বকুনি খেল। মা রাগ করে বলে "তুমি কোনো জিনিসে হাত দেবে না।" কিছু পরে মা ছেলেটিকে চান করতে যেতে বললে ছেলেটি গেল না, একইভাবে দাঁড়িয়ে থাক তারপরে মাকে বলল, "তুমি আমাকে কো জিনিসে হাত দিতে বারণ করেছ, চান ক কী ভাবে?"

গার্গী মিত্র (বয়স—১

চিঠি চিঠি

মাসিক আনন্দমেলা আমার প্রিয় পত্রিব এই পত্রিকার টারজান ও টিনটিনটা আমার খ ভাল লাগে। এই পত্রিকাটি যদি ১৫ দিন অন্ত বার করা হয় তাহলে খুব ভাল হয়।

বিশ্বরূপ মজুমদার

আমি আনন্দমেলা পড়তে আর তে'তু খেতে ভালবাসি। সম্রাটকে আমার খুব ভা লেগেছে। সম্রাট ভীষণ দুষ্টু। আমিও দুষ্ট সুমিত দাদার মত আমিও ফার্স্ট হব।

সাধনা দাশ (বয়স

টিয়া

আমার ছোট্ট পাখি টিয়া
নামটি যে তার পিয়া
সারাদিন গায় গান
খায় কচিকচি ধান॥

অভিজিৎ প্রামানিক। (বয়স ৭

আবোল তাবোল

পুব আকাশে নীল,
রান্নাঘরে খিল।
মেয়ে হাসে খিল-খিল,
জানলায় সন্দীপ শীল।

সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স—৭)

মেঘ চলেছে

মেঘ চলেছে ভেসে—
মেঘ বলল হেসে,
যাচ্ছি উড়ে নীল
আকাশের ওই দেশে।

তমাল দেব (বয়স—১১)

এই কমিকগুলি পাওয়া যায়ঃ

১। শকুন্তলা
২। রাণা প্রতাপ
৩। শিব পার্বতী
৪। ভীষ্ম
৫। বান্দা বাহাদুর
৬। পদ্মিনী
৭। জাতক কাহিনী
৮। বাল্মিকী
৯। তারাবাঈ
১০। রণজীৎ সিং

ইংরিজী হিন্দী মারাঠী গুজরাটী ভাষায় পাওয়া যায়

তোমার নাম ও ঠিকানা, এবং কোন নম্বর (গুলি) -এর কমিক কোন ভাষায় চাও লিখে, র‍্যাপার সমেত এই ঠিকানায় পাঠাওঃ

পার্লে প্রডাক্টস প্রাঃ লিঃ, নির্লন হাউস. ২৫৪-বি, ডাঃ অ্যানী বেসান্ত রোড, বম্বে ৪০০০২৫।

everest/538/PP-bn